বউ-ঠাকুরানীর হাট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

সূচনা 4

প্রথম পরিচ্ছেদ 6

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 15

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 22

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 25

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 33

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 40

সপ্তম পরিচ্ছেদ 48

অষ্টম পরিচ্ছেদ 56

নবম পরিচ্ছেদ 61

দশম পরিচ্ছেদ 67

একাদশ পরিচ্ছেদ 74

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 83

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 91
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 96
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 100
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 106
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 110
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 115
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ 118
বিংশ পরিচ্ছেদ 125
একবিংশ পরিচ্ছেদ 128
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 135
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 139
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ 144
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 148
ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ 154
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 157
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 163

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ 169
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 175
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 179
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 188
ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 192
চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 205
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ 209
ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 213
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ 216

সূচনা

অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে একসময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।

প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউ-ঠাকুরানীর হাট গল্পে– একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজও হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়ে নি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা-তা কাণ্ড করতে বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।

সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম

লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে– এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।

এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী- কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে-সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।

উদয়ন, ২৯। ১। ৪০

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।

সুরমা কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। একদিন সুখের দিন আসিবে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি তো আর কোনো সুখ চাই না। আমি চাই, আমি রাজপ্রাসাদে না যদি জন্মাইতাম, যুবরাজ না যদি হইতাম, যশোহর-অধিপতির ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম প্রজার প্রজা হইতাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার সিংহাসনের তাঁহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব গৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী না হইতাম! কী তপস্যা করিলে এ-সমস্ত অতীত উল্‌টাইয়া যাইতে পারে!"

সুরমা অতি কাতর হইয়া যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত দুই হাতে লইয়া চাপিয়া ধরিলেন, ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যুবরাজের ইচ্ছা পুরাইতে প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণ দিলেও এই ইচ্ছা পুরাইতে পারিবেন না, এই দুঃখ।

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, রাজার ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই সুখী হইতে পারিলাম না। রাজার ঘরে সকলে বুঝি কেবল উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মায়, সন্তান হইয়া জন্মায় না। পিতা ছেলেবেলা হইতেই আমাকে প্রতিমুহূর্তে পরখ করিয়া দেখিতেছেন, আমি তাঁহার উপার্জিত যশোমান বজায় রাখিতে পারিব কি না, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না, রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে পারিব কি না। আমার প্রতি কার্য, প্রতি অঙ্গভঙ্গী তিনি

পরীক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, স্নেহের চক্ষে নহে। আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রী, রাজসভাসদগণ, প্রজারা আমার প্রতি কথা প্রতি কাজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইয়া আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া আসিতেছে। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল– না, আমার দ্বারা এ বিপদে রাজ্য রক্ষা হইবে না। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। সকলেই আমাকে অবহেলা করিতে লাগিল, পিতা আমাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। একবার খোঁজও লইতেন না।

সুরমার চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, “আহা! কেমন করিয়া পারিত!”

তাহার দুঃখ হইল, তাহার রাগ হইল, সে কহিল, “তোমাকে যাহারা নির্বোধ মনে করিত তাহারাই নির্বোধ।”

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাসিলেন, সুরমার চিবুক ধরিয়া তাহার রোষে আরক্তিম মুখখানি নাড়িয়া দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “না, সুরমা, সত্য সত্যই আমার রাজ্যশাসনের বুদ্ধি নাই। তাহার যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেছে। আমার যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন মহারাজ কাজ শিখাইবার জন্য হোসেনখালি পরগনার ভার আমার হাতে সমর্পণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল, প্রজারা আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল। রাজসভার সকলেরই মত হইল, যুবরাজ প্রজাদের যখন অত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই বুঝা যাইতেছে উঁহার দ্বারা রাজ্যশাসন কখনো ঘটিতে পারিবে না। সেই অবধি মহারাজ আমার পানে আর বড়ো একটা তাকাইতেন না। বলিতেন– ও কুলাঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্ত রায়ের মতো হইবে, সেতার বাজাইয়া নাচিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধঃপাতে দিবে।”

সুরমা আবার কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। হাজার হউন, পিতা তো বটেন। আজকাল রাজ্য-উপার্জন, রাজ্যবৃদ্ধির একমাত্র দুরাশায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে স্নেহের ঠাঁই নাই। যতই তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার স্নেহের রাজ্য বাড়িতে থাকিবে।"

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী, কিন্তু এইবারে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এক তো আশার শেষ নাই; দ্বিতীয়ত, পিতার রাজ্যের সীমা যতই বাড়িতে থাকিবে, রাজ্য যতই লাভ করিতে থাকিবেন, ততই তাহা হারাইবার ভয় তাঁহার মনে বাড়িতে থাকিবে; রাজকার্য যতই গুরুতর হইয়া উঠিবে, ততই আমাকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করিবেন।"

সুরমা ভুল বুঝে নাই, ভুল বিশ্বাস করিত মাত্র; বিশ্বাস বুদ্ধিকেও লঙ্ঘন করে। সে একমনে আশা করিত, এইরূপই যেন হয়।

"চারিদিকে কোথাও বা কৃপাদৃষ্টি কোথাও বা অবহেলা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি মাঝে মাঝে পলাইয়া রায়গড়ে দাদামহাশয়ের কাছে যাইতাম। পিতা বড়ো একটা খোঁজ লইতেন না। আঃ, সে কী পরিবর্তন। সেখানে গাছপালা দেখিতে পাইতাম, গ্রামবাসীদের কুটিরে যাইতে পারিতাম, দিবানিশি রাজবেশ পরিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়া জান তো, যেখানে দাদামহাশয় থাকেন, তাহার ত্রিসীমায় বিষাদ ভাবনা বা কঠোর গাম্ভীর্য তিষ্ঠিতে পারে না। গাহিয়া বাজাইয়া, আমোদ করিয়া চারিদিক পূর্ণ করিয়া রাখেন। চারিদিকে উল্লাস, সদ্ভাব, শান্তি। সেইখানে গেলেই আমি ভুলিয়া যাইতাম যে, আমি যশোহরের যুবরাজ। সে কী আরামের ভুল। অবশেষে আমার বয়স যখন আঠারো বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে সবুজ কুঞ্জবন, সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম।"

সুরমা বলিয়া উঠিল, "ও-কথা অনেক বার শুনিয়াছি।"

উদয়াদিত্য। আর-একবার শুন। মাঝে মাঝে এক-একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে, সে-কথাগুলা যদি বাহির করিয়া না দিই, তবে আর বাঁচিব কী করিয়া। সেই কথাটা তোমার কাছে এখনও বলিতে লজ্জা করে, কষ্ট হয়, তাই বারবার করিয়া বলি। যেদিন আর লজ্জা করিবে না, কষ্ট হইবে না, সেদিন বুঝিব আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, সেদিন আর বলিব না।

সুরমা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত প্রিয়তম? তুমি যদি পাপ করিয়া থাক তো সে পাপের দোষ, তোমার দোষ নহে। আমি কি তোমাকে জানি না? অন্তর্যামী কি তোমার মন দেখিতে পান না?

উদয়াদিত্য বলিতে লাগিলেন, "রুক্মিণীর বয়স আমার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়ো। সে একাকিনী বিধবা। দাদামহাশয়ের অনুগ্রহে সে রায়গড়ে বাস করিতে পাইত। মনে নাই, সে আমাকে কী কৌশলে প্রথমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। তখন আমার মনের মধ্যে মধ্যাহ্নের কিরণ জ্বলিতেছিল। এত প্রখর আলো যে, কিছুই ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, চারিদিকে জগৎ জ্যোতির্ময় বাষ্পে আবৃত। সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিতেছিল; কিছুই আশ্চর্য, কিছুই অসম্ভব মনে হইত না; পথ বিপথ, দিক বিদিক সমস্ত এক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার পূর্বেও আমার এমন কখনো হয় নাই, ইহার পরেও আমার এমন কখনো হয় নাই। জগদীশ্বর জানেন, তাঁহার কী উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই ক্ষুদ্র দুর্বল বুদ্ধিহীন হৃদয়ের বিরুদ্ধে এক দিনের জন্য সমস্ত জগৎকে যেন উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্বচরাচর যেন একতন্ত্র হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে মুহূর্তে বিপথে লইয়া গেল। মুহূর্তমাত্র– আর অধিক নয়– সমস্ত বহির্জগতের মুহূর্তস্থায়ী এক নিদারুণ আঘাত, আর মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষীণ হৃদয়ের মূল বিদীর্ণ হইয়া গেল,

বিদ্যুদ্‌বেগে সে ধূলিকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িল। তাহার পরে যখন উঠিল তখন ধূলিধূসরিত, ম্লান– সে ধূলি আর মুছিল না, সে মলিনতার চিহ্ন আর উঠিল না। আমি কী করিয়াছিলাম বিধাতা, যে, পাপে এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভ্রকে কালি করিলে? দিনকে রাত্রি করিলে? আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে মালতী ও জুঁই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালো হইয়া গেল।"

বলিতে বলিতে উদয়াদিত্যের গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত নেত্র অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎশিখা কাঁপিয়া উঠিল। সুরমা হর্ষে, গর্বে, কষ্টে কহিল, "আমার মাথা খাও, ও-কথা থাক্।"

উদয়াদিত্য। ধীরে ধীরে যখন রক্ত শীতল হইয়া গেল, সকলই তখন যথাযথ পরিমাণে দেখিতে পাইলাম। যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্তনয়ন মাতালের কুজ্ঝটিকাময় ঘূর্ণমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া প্রকৃত কার্যক্ষেত্র বলিয়া মনে হইল, তখন মনের কী অবস্থা! কোথা হইতে কোথায় পতন! শত সহস্র লক্ষ ক্রোশ পাতালের গহ্বরে, অন্ধ অন্ধতর অন্ধতম রজনীর মধ্যে একেবারে পলক না ফেলিতে পড়িয়া গেলাম। দাদামহাশয় স্নেহভরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তাঁহার কাছে মুখ দেখাইলাম কী বলিয়া? কিন্তু সেই অবধি আমাকে রায়গড় ছাড়িতে হইল। দাদামহাশয়, আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না; আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার এমনি ভয় করিত যে, আমি কোনোমতেই যাইতে পারিতাম না। তিনি স্বয়ং আমাকে ও ভগিনী বিভাকে দেখিতে আসিতেন। অভিমান নাই, কিছু নাই। জিজ্ঞাসাও করিতেন না, কেন যাই নাই। আমাদের দেখিতেন, আমোদ-উল্লাস করিতেন ও চলিয়া যাইতেন।"

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় মৃদু কোমল প্রেমে তাঁহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি প্লাবিত করিয়া সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরমা বুঝিল, এইবার কী কথা

আসিতেছে। মুখ নত হইয়া আসিল; ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল। যুবরাজ দুই হস্তে তাহার দুই কপোল ধরিয়া নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। অধিকতর নিকটে গিয়া বসিলেন; মুখখানি নিজের স্কন্ধে ধীরে ধীরে রাখিলেন। কটিদেশ বামহস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন ও গভীর প্রশান্ত প্রেমে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তার পর কী হইল, সুরমা বলো দেখি? এই বুদ্ধিতে দীপ্যমান, স্নেহপ্রেমে কোমল, হাস্যে উজ্জ্বল ও প্রশান্ত ভাবে বিমল মুখখানি কোথা হইতে উদয় হইল? আমার সে গভীর অন্ধকার ভাঙিবে আশা ছিল কি? তুমি আমার ঊষা, আমার আলো, আমার আশা, কী মায়ামন্ত্রে সে আঁধার দূর করিলে?"

যুবরাজ বার বার সুরমার মুখচুম্বন করিলেন। সুরমা কিছুই কথা কহিল না, আনন্দে তাহার চোখ জলে পুরিয়া আসিল। যুবরাজ কহিলেন, "এতদিনের পরে আমি যথার্থ আশ্রয় পাইলাম। তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম যে আমি নির্বোধ নই, তাহাই বিশ্বাস করিলাম, তাহাই বুঝিতে পারিলাম। তোমারই কাছে শিখিলাম বুদ্ধি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মতো বাঁকাচোরা উঁচুনিচু নহে, রাজপথের ন্যায় সরল সমতল প্রশস্ত। পূর্বে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতাম, আপনাকে অবহেলা করিতাম। কোনো কাজ করিতে সাহস করিতাম না। মন যদি বলিত, ইহাই ঠিক, আত্মসংশয়ী সংস্কার বলিত, উহা ঠিক না হইতেও পারে। যে যেরূপ ব্যবহার করিত তাহাই সহিয়া থাকিতাম, নিজে কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিতাম না। এতদিনের পরে আমার মনে হইল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মন যাহা ভালো বলে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে চাই। তোমার উপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর, তখন

আমিও আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। সুকুমার শরীরে এত বল কোথায় ছিল যাহাতে আমাকেও তুমি বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছ?

কী অপরিসীম নির্ভরের ভাবে সুরমা স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ধরিল। কী সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জী দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ কহিল, "আমার আর কিছুই নাই কেবল তুমি আছ, তাই আমার সব আছে।"

বাল্যকাল হইতে উদয়াদিত্য আত্মীয়-স্বজনের উপেক্ষা সহিয়া আসিতেছেন, মাঝে মাঝে এক-একদিন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সুরমার নিকট সেই শতবার-কথিত পুরানো জীবনকাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সোপানে সোপানে আলোচনা করিতে তাঁহার বড়ো ভালো লাগে। উদয়াদিত্য কহিলেন, "এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে সুরমা? এদিকে রাজসভায় সভাসদগণ কেমন একপ্রকার কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি চায়, ওদিকে অন্তঃপুরে মা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন। দাসদাসীরা পর্যন্ত তোমাকে তেমন মানে না। আমি কাহাকেও ভালো করিয়া কিছু বলিতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি, সহ্য করিয়া যাই। তোমার তেজস্বী স্বভাব, কিন্তু তুমিও নীরবে সহিয়া যাও। যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, আমা হইতে তোমাকে কেবল অপমান আর কষ্ট সহ্য করিতে হইল, তখন আমাদের এ বিবাহ না হইলেই ভালো ছিল।"

সুরমা। সে কী কথা নাথ। এই সময়েই তো সুরমাকে আবশ্যক। সুখের সময় আমি তোমার কী করিতে পারিতাম! সুখের সময় সুরমা বিলাসের দ্রব্য, খেলিবার জিনিস। সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাজে লাগিতেছি, তোমার জন্য দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে, সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদয় কষ্ট কেন আমি বহন করিতে পারিলাম না।

যুবরাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি নিজের জন্য তেমন ভাবি না। সকলই সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার জন্য তুমি কেন অপমান সহ্য করিবে? তুমি যথার্থ স্ত্রীর মতো আমার দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিয়াছ, শ্রান্তির সময় বিশ্রাম দিয়াছ, কিন্তু আমি স্বামীর মতো তোমাকে অপমান হইতে, লজ্জা হইতে, রক্ষা করিতে পারিলাম না। তোমার পিতা শ্রীপুর-রাজ আমার পিতাকে প্রধান বলিয়া না মানাতে, আপনাকে, যশোহরছত্রের অধীন বলিয়া স্বীকার না করাতে, পিতা তোমার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া নিজের প্রধানত্ব বজায় রাখিতে চান। তোমাকে কেহ অপমান করিলে তিনি কানেই আনেন না। তিনি মনে করেন, তোমাকে যে পুত্রবধূ করিয়াছেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এক-একবার মনে হয়, আর পারিয়া উঠি না, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিয়া যাই। এতদিনে হয়তো যাইতাম, তুমি কেবল আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ।"

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকার-তোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, গৃহদ্বার রুদ্ধ, দৈবাৎ দু-একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল।

শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন, "কেন বিভা? কী হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?"

পাঠকেরা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন বিভা উদয়াদিত্যের ভগিনী। বিভা কহিল, "এতক্ষণে বুঝি সর্বনাশ হইল!"

সুরমা ও উদয়াদিত্য একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "কেন, কী হইয়াছে?" বিভা ভয়কম্পিত স্বরে চুপি চুপি কী কহিল। বলিতে বলিতে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "দাদা কী হইবে?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি তবে চলিলাম।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না না, তুমি যাইয়ো না।"

উদয়াদিত্য। কেন বিভা?

বিভা। পিতা যদি জানিতে পারেন? তোমার উপরে যদি রাগ করেন?

সুরমা কহিল, "ছিঃ বিভা; এখন কি তাহা ভাবিবার সময়?"

উদয়াদিত্য বস্ত্রাদি পরিয়া কটিবন্ধে তরবারি বাঁধিয়া প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিলেন। বিভা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা তুমি যাইয়ো না, তুমি লোক পাঠাইয়া দাও, আমার বড়ো ভয় করিতেছে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিভা এখন বাধা দিস নে; আর সময় নাই।" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

বিভা সুরমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী হইবে ভাই? বাবা যদি টের পান?"

সুরমা কহিল, "আর কী হইবে? স্নেহের বোধ করি আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেটুকু আছে সেটুকু গেলেও বড়ো একটা ক্ষতি হইবে না।"

বিভা কহিল, "না ভাই, আমার বড়ো ভয় করিতেছে। পিতা যদি কোনোপ্রকার হানি করেন। যদি দণ্ড দেন?"

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক না হয় যেন। এ বিশ্বাস আমার ভাঙিয়ো না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, কাজটা কি ভালো হইবে?”

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ কাজটা?”

মন্ত্রী কহিলেন, “কাল যাহা আদেশ করিয়াছিলেন।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “কাল কী আদেশ করিয়াছিলাম?”

মন্ত্রী কহিলেন, “আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে।”

প্রতাপাদিত্য আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ আদেশ করিয়াছিলেন,যখন বসন্ত রায় যশোহরে আসিবার পথে শিমউলতলির চাটিতে আশ্রয় লইবেন তখন–”

প্রতাপাদিত্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, “তখন কী? কথাটা শেষ করিয়াই ফেলো।”

মন্ত্রী। তখন দুই জন পাঠান গিয়া–

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁহাকে নিহত করিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “মন্ত্রী, হঠাৎ তুমি শিশু হইয়াছ নাকি? একটা কথা শুনিতে দশটা প্রশ্ন করিতে হয় কেন? কথাটা মুখে আনিতে বুঝি সংকোচ হইতেছে! এখন বোধ করি তোমার রাজকার্যে মনোযোগ দিবার বয়স গিয়াছে, এখন পরকাল চিন্তার সময় আসিয়াছে। এতদিন অবসর প্রার্থনা কর নাই কেন?”

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটা ভালো বুঝিতে পারেন নাই।

প্রতাপ। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে কাজটা করিতে পারি, তুমি তাহা মুখে আনিতেও পার না? তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল, আমি যখন এ কাজটা করিতে যাইতেছি, তখন অবশ্য তাহার গুরুতর কারণ আছে; আমি অবশ্য ধর্ম অধর্ম সমস্ত ভাবিয়াছিলাম।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, আমি–

প্রতাপ। চুপ করো, আমার সমস্ত কথাটা শোনো আগে। আমি যখন এ কাজটা– আমি যখন নিজের পিতৃব্যকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশি ভাবিয়াছি। এ কাজে অধর্ম নাই। আমার ব্রত এই– এই যে ম্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আর্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচারভ্রষ্ট হইতেছে, এই ম্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আর্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই, সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়; যাহারা যবনের মিত্র, তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের বাহুকে কাটিয়া ফেলা যায়; আমার ইচ্ছা যায় বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ওই বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়-বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।

মন্ত্রী কহিলেন, “এ-বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অন্য মত ছিল না।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “হাঁ ছিল। ঠিক কথা বলো। এখনও আছে। দেখো মন্ত্রী, যতক্ষণ আমার মতের সহিত তোমার মত না মিলিবে, ততক্ষণ তাহা প্রকাশ করিয়ো। সে সাহস যদি না থাকে তবে এ পদ তোমার নহে। সন্দেহ থাকে তো বলিয়ো। আমাকে বুঝাইবার অবসর দিয়ো। তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ; “না’ বলিয়ো না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে। ইহার উত্তর আছে। পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন, ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারি না?”

এ বিষয়ে– অর্থাৎ ধর্ম অধর্ম বিষয়ে যথার্থই মন্ত্রীর কোনো মতামত ছিল না। মন্ত্রী যতদূর তলাইয়াছিলেন, রাজা ততদূর তলাইতে পারেন নাই। মন্ত্রী বিলক্ষণ জানিতেন যে, উপস্থিত বিষয়ে তিনি যদি সংকোচ দেখান তাহা হইলে রাজা আপাতত কিছু রুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার জন্য মনে মনে সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ না করিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এককালে-না-এককালে রাজার সন্দেহ ও আশঙ্কা জন্মিতে পারে।

মন্ত্রী কহিলেন, “আমি বলিতেছিলাম কি, দিল্লীশ্বর এ সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই রুষ্ট হইবেন।”

প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ হাঁ রুষ্ট হইবেন! রুষ্ট হইবার অধিকার তো সকলেরই আছে। দিল্লীশ্বর তো আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ আছে, বীরবল আছে, আমাদের বসন্ত রায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ; কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিয়ো না।”

মন্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, “আজ্ঞা, মহারাজ, ফাঁকা রোষকে আমিও বড়ো একটা ডরাই না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার যদি থাকে তাহা হইলে ভাবিতে হয় বই কি। দিল্লীশ্বরের রোষের অর্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য।”

প্রতাপাদিত্য ইহার একটা সদুত্তর না দিতে পারিয়া কহিলেন, “দেখো মন্ত্রী, দিল্লীশ্বরের ভয় দেখাইয়া আমাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, তাহাতে আমার নিতান্ত অপমান বোধ হয়।”

মন্ত্রী কহিলেন, “প্রজারা জানিতে পারিলে কী বলিবে?”

প্রতাপ। জানিতে পারিলে তো?

মন্ত্রী। এ কাজ অধিকদিন চাপা রহিবে না। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ আপনার বিরোধী হইবে। যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতে চান, তাহা সমূলে বিনাশ পাইবে। আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে ও বিবিধ নিগ্রহ সহিতে হইবে।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, আবার তোমাকে বলিতেছি, আমি যাহা করি তাহা বিশেষ ভাবিয়া করি। অতএব আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলে মিছামিছি কতকগুলা ভয় দেখাইয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, আমি শিশু নহি। প্রতি পদে আমাকে বাধা দিবার জন্য, তোমাকে আমার নিজের শৃঙ্খলস্বরূপে রাখি নাই।

মন্ত্রী চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি রাজার দুইটি আদেশ ছিল। এক, যতক্ষণ মতের অমিল হইবে ততক্ষণ প্রকাশ করিবে; দ্বিতীয়ত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া রাজাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। মন্ত্রী আজ পর্যন্ত এই আদেশের ভালোরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন, “মহারাজ, দিল্লীশ্বর–” প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, “আবার দিল্লীশ্বর? মন্ত্রী, দিনের মধ্যে তুমি যতবার দিল্লীশ্বরের নাম কর ততবার যদি জগদীশ্বরের নাম করিতে তাহা হইলে পরকালের কাজ গুছাইতে পারিতে। যতক্ষণে না আমার এই কাজটা শেষ হইবে, ততক্ষণ দিল্লীশ্বরের নাম মুখে আনিয়ো না। যখন আজ বিকালে এই কাজ সমাধার সংবাদ পাইব, তখন আসিয়া আমার কানের কাছে

তুমি মনের সাধ মিটাইয়া দিল্লীশ্বরের নাম জপিয়ো। ততক্ষণ একটু আত্মসংযম করিয়া থাকো।”

মন্ত্রী আবার চুপ করিয়া গেলেন। দিল্লীশ্বরের কথা বন্ধ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য–”

রাজা কহিলেন, “দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, এখন অবশেষে সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে না কি?”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝিতেছেন। আপনার কাজে বাধা দিবার অভিপ্রায় আমার মূলেই নাই।”

প্রতাপাদিত্য ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন, “তবে কী বলিতেছিলে বলো।”

মন্ত্রী বলিলেন, “কাল রাত্রে যুবরাজ সহসা অশ্বারোহণ করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “কোন্ দিকে গেছেন?”

মন্ত্রী কহিলেন, “পূর্বাভিমুখে।”

প্রতাপাদিত্য দাঁতে দাঁত লাগাইয়া কহিলেন, “কখন গিয়াছিল?”

মন্ত্রী। কাল প্রায় অর্ধরাত্রের সময়।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে কি এখানেই আছে?”

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সে তাহার পিত্রালয়ে থাকিলেই তো ভালো হয়।

মন্ত্রী কোনো উত্তর দিলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “উদয়াদিত্য কোনোকালেই রাজার মতো ছিল না। ছেলেবেলা হইতে প্রজাদের সঙ্গেই তাহার মেশামেশি। আমার সন্তান যে এমন হইবে তাহা কে

জানিত? সিংহ-শাবককে কি, কী করিয়া সিংহ হইতে হয় তাহা শিখাইতে হয়? তবে কিনা– নরাণাং মাতুলক্রমঃ। বোধ করি সে তাহাদের মাতামহদের স্বভাব পাইয়াছে। তাহার উপরে আবার সম্প্রতি শ্রীপুরের ঘরে বিবাহ দিয়াছি; সেই অবধি বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। ঈশ্বর করুন, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়, আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা শেষ যদি না করিতে পারি তাহা হইলে মরিবার সময়ে ভাবনা না থাকিয়া যায় যেন। সে কি তবে এখনও ফিরিয়া আসে নাই?"

মন্ত্রী। না মহারাজ।

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "একজন প্রহরী তাহার সঙ্গে কেন যায় নাই?"

মন্ত্রী। একজন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বারণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ। অদৃশ্যভাবে দূরে দূরে থাকিয়া কেন যায় নাই?

মন্ত্রী। তাহারা কোনোপ্রকার অন্যায় সন্দেহ করে নাই।

প্রতাপ। সন্দেহ করে নাই! মন্ত্রী, তুমি কি আমাকে বুঝাইতে চাও, তাহারা বড়ো ভালো কাজ করিয়াছিল? মন্ত্রী তুমি আমাকে অনর্থক যাহা-তাহা একটা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়ো না। প্রহরীরা কর্তব্য কাজে বিশেষ অবহেলা করিয়াছে। সে-সময়ে দ্বারে কাহারা ছিল ডাকিয়া পাঠাও। ঘটনাটির জন্য যদি আমার কোনো একটা ইচ্ছা বিফল হয়, তবে আমি সর্বনাশ করিব। মন্ত্রী, তোমারও তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। আমার কাছে তুমি প্রমাণ করিতে আসিয়াছ, এ কাজের জন্য কেহই দায়ী নহে। তবে এ দায় তোমার।

প্রতাপাদিত্য প্রহরীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ। দিল্লীশ্বরের কথা কী বলিতেছিলে?"

মন্ত্রী। শুনিলাম আপনার নামে দিল্লীশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিয়াছে।

প্রতাপ। কে? তোমাদের যুবরাজ উদয়াদিত্য নাকি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, এমন কথা বলিবেন না। কে করিয়াছে সন্ধান পাই নাই।

প্রতাপ। যেই করুক, তাহার জন্য অধিক ভাবিয়ো না, আমিই দিল্লীশ্বরের বিচারকর্তা, আমিই তাহার দণ্ডের উদ্‌যোগ করিতেছি। সে পাঠানেরা এখনও ফিরিল না? উদয়াদিত্য এখনও আসিল না? শীঘ্র প্রহরীকে ডাকো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজন পথ দিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে যুবরাজ অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পথ দীর্ঘ সরল প্রশস্ত বলিয়া কোনো ভয়ের আশঙ্কা নাই। স্তব্ধ রাত্রে অশ্বের খুরের শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দুই-একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, দুই-একটা শৃগাল চকিত হইয়া পথ ছাড়িয়া বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইতেছে। আলোকের মধ্যে আকাশের তারা ও পথপ্রান্তস্থিত গাছে জোনাকি; শব্দের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রাম শব্দ, মনুষ্যের মধ্যে কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে। পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ পথ ছাড়িয়া একটা মাঠে নামিলেন। অশ্বের বেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিতে হইল। দিনের বেলায় বৃষ্টি হইয়াছিল, মাটি ভিজা ছিল, পদে পদে অশ্বের পা বসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া অশ্ব তিন বার পড়িয়া গেল। শ্রান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, মুখে ফেন, পশ্চাতের পদদ্বয়ের ঘর্ষণে ফেন জন্মিয়াছে, পঞ্জরের ভিতর হইতে একটা শব্দ বাহির হইতেছে, সর্বাঙ্গ ঘর্মে প্লাবিত। এদিকে দারুণ গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশমাত্র নাই, এখনও অনেকটা পথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহুতর জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ অবশেষে একটা কাঁচা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বকে আবার দ্রুতবেগে ছুটাইলেন। একবার তাহার স্কন্ধ চাপড়াইয়া উৎসাহ দিয়া ডাকিলেন, “সুগ্রীব।” সে চকিতে একবার কান খাড়া করিয়া বড়ো বড়ো চোখে বঙ্কিম দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিল, একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিল ও সবলে মুখ নামাইয়া রাশ শিথিল করিয়া লইল ও গ্রীবা নত করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। দুই পার্শ্বের গাছপালা চোখে ভালো দেখা যাইতেছে না,

আকাশে চাহিলে মনে হইতেছে যেন দলে দলে নক্ষত্রেরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো সবেগে উড়িয়া যাইতেছে এবং সেই স্তব্ধবায়ু আকাশে বায়ু তরঙ্গিত হইয়া কানের কাছে সাঁ সাঁ করিতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, লোকালয়ের কাছে শৃগালেরা যখন প্রহর ডাকিয়া গেল, তখন যুবরাজ শিমুলতলির চটির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। নামিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, তাহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, "সুগ্রীব" বলিয়া কতবার ডাকিলেন, সে আর নড়িল না! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবরাজ দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। বার বার আঘাতের পর চটির অধ্যক্ষ দ্বার না খুলিয়া জানালার মধ্য দিয়া কহিল, "এত রাত্রে তুমি কে গো?" দেখিল একজন সশস্ত্র যুবক দ্বারে দাঁড়াইয়া।

যুবরাজ কহিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, দ্বার খোলো।"

সে কহিল, "দ্বার খুলিবার আবশ্যক কী, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, জিজ্ঞাসা করো না।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়গড়ের রাজা বসন্ত রায় এখানে আছেন?"

সে কহিল, "আজ্ঞা, সন্ধ্যার পর তাঁহার আসিবার কথা ছিল বটে কিন্তু এখনও আসেন নাই। আজ বোধ করি তাঁহার আসা হইল না।"

যুবরাজ দুইটি মুদ্রা লইয়া শব্দ করিয়া কহিলেন, "এই লও।"

সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া মুদ্রা দুইটি লইল। তখন যুবরাজ তাহাকে কহিলেন, "বাপু, আমি একবারটি তোমার চটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, কে কে আছে?"

চটি-রক্ষক সন্দিগ্ধভাবে কহিল, "না মহাশয় তাহা হইবে না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমাকে বাধা দিয়ো না। আমি রাজবাটীর কর্মচারী। দুই জন অপরাধীর অনুসন্ধানে আসিয়াছি।"

এই কথা বলিয়াই তিনি প্রবেশ করিলেন। চটি-রক্ষক তাঁহাকে আর বাধা দিল না। তিনি সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। না বসন্ত রায়, না তাঁহার অনুচর, না কোনো পাঠানকে দেখিতে পাইলেন। কেবল দুই জন সুপ্তোত্থিতা প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া উঠিল, "আ মরণ, মিনসে অমন করিয়া তাকাইতেছিস কেন?"

চটি হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন যে, ভালোই হইয়াছে, হয়তো আজ দৈবক্রমে তিনি আসিতে পারেন নাই। আবার মনে করিলেন, যদি ইহার পূর্ববর্তী কোনো চটিতে থাকেন ও পাঠানেরা তাঁহার অনুসন্ধানে সেখানে গিয়া থাকে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, বিপরীত দিক হইতে এক জন অশ্বারোহী আসিতেছে। নিকটে আসিলে কহিলেন, "কে ও, রতন নাকি?" সে অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল "আজ্ঞা হাঁ। যুবরাজ, আপনি এত রাত্রে এখানে যে?"

যুবরাজ কহিলেন, তাহার কারণ পরে বলিব। এখন বলো তো দাদামহাশয় কোথায় আছেন।

"আজ্ঞা, তাঁহার তো চটিতেই থাকিবার কথা।"

"সে কী! সেখানে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।"

সে অবাক হইয়া কহিল, "ত্রিশ জন অনুচর সমেত মহারাজ যশোর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। আমি কার্যবশত পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। এই চটিতে আজ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত মিলিবার কথা।"

"পথে যেরূপ কাদা তাহাতে পদচিহ্ন থাকিবার কথা, তাহাই অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। তোমার ঘোটক লইলাম। তুমি পদব্রজে আইস।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজন পথের ধারে অশথ গাছের তলায় বাহকশূন্য ভূতলস্থিত এক শিবিকার মধ্যে বৃদ্ধ বসন্ত রায় বসিয়া আছেন। কাছে আর কেহ নাই, কেবল একটি পাঠান শিবিকার বাহিরে। একটা জনকোলাহল দূরে মিলাইয়া গেল। রজনী স্তব্ধ হইয়া গেল। বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি যে গেলে না?"

পাঠান কহিল, "হুজুর, কী করিয়া যাইব? আপনি আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আপনার সকল অনুচরগুলিকেই পাঠাইলেন। আপনাকে এই পথের ধারে রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইব, এতবড়ো অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাহরাইবেন না। আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী; পরকালে সে ঋণ তাহাকে শোধ করিতে হইবে; যে আমার উপকার করে আমি তাহার কাছে ঋণী, কিন্তু কোনোকালে তাহার সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

বসন্ত রায় মনে মনে কহিলেন, বাহবা, লোকটা তো বড়ো ভালো। কিছুক্ষণ বিতর্ক করিয়া পালকি হইতে তাঁহার টাকবিশিষ্ট মাথাটি বাহির করিয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি বড়ো ভালো লোক।"

খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ এক সেলাম করিলেন। এ-বিষয়ে বসন্ত রায়ের সহিত খাঁ সাহেবের কিছুমাত্র মতের অনৈক্য ছিল না। বসন্ত রায় মশালের আলোকে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তোমাকে বড়োঘরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।"

পাঠান আবার সেলাম করিয়া কহিল, "কেয়া তাজ্জব, মহারাজ, ঠিক ঠাহরাইয়াছেন।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "এখন তোমার কী করা হয়?"

পাঠান নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "হুজুর, দুরবস্থায় পড়িয়াছি, এখন চাষবাস করিয়া গুজরান চালাইতে হইতেছে। কবি বলিতেছেন, হে অদৃষ্ট, তুমি যে তৃণকে তৃণ করিয়া গড়িয়াছ, ইহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তুমি যে অশথ গাছকে অশথ গাছ করিয়া গড়িয়া অবশেষে ঝড়ের হাতে তাহাকে তৃণের সহিত সমতল করিয়া শোয়াও ইহাতেই আন্দাজ করিতেছি, তোমার মনটা পাথরে গড়া।"

বসন্ত রায় নিতান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, বাহবা, কবি কী কথাই বলিয়াছেন। সাহেব, যে দুইটি বয়েৎ আজ বলিলে, ওই দুইটি লিখিয়া দিতে হইবে।"

পাঠান ভাবিল, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বুড়া, লোক বড়ো সরেস; গরিবের বহুৎ কাজে লাগিতে পারিবে। বসন্ত রায় ভাবিলেন, আহা, এককালে যে ব্যক্তি বড়োলোক ছিল আজ তাহার এমন দুরবস্থা। চপলা লক্ষ্মীর এ বড়ো অত্যাচার। মনে মনে তিনি কিছু কাতর হইলেন, পাঠানকে কহিলেন, "তোমার যে-রকম সুন্দর শরীর আছে, তাহাতে তো তুমি অনায়াসে সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইতে পার।"

পাঠান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "হুজুর, পারি বইকি। সেই তো আমাদের কাজ। আমার পিতা-পিতামহেরা সকলেই তলোয়ার হাতে করিয়া মরিয়াছেন, আমারও সেই একমাত্র সাধ আছে। কবি বলেন,–"

বসন্ত রায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কবি যাহাই বলুন বাপু, আমার কাজ যদি গ্রহণ কর, তবে তলোয়ার হাতে করিয়া মরিবার সাধ মিটিতেও পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ হইতে খোলা তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বুড়া হইয়া পড়িয়াছি, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, ভগবান করুন, আর যেন লড়াই করিবার দরকার না হয়। বয়স গিয়াছে; তলোয়ার ত্যাগ করিয়াছি। এখন তলোয়ারের পরিবর্তে আর-এক জন আমার পাণিগ্রহণ

করিয়াছে।” এই বলিয়াই পার্শ্বে শায়িত সহচরী সেতারটিকে দুই-একটি ঝংকার দিয়া একবার জাগাইয়া দিলেন।

পাঠান ঘাড় নাড়িয়া চোখ বুজিয়া কহিল, “আহা, যাহা বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বয়েৎ আছে যে, তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।”

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “কী বলিলে খাঁ সাহেব? সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার!” চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন, যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই যেন অধিকতর অবাক হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বয়েৎটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তলোয়ার যে এতবড়ো ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না– কেমন করিয়া বলিব নাশ করা যায়? রোগীকে বধ করিয়া রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মধুর জিনিস, তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা? বাঃ কী তারিফ!” বৃদ্ধ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, শিবিকার বাহিরে পা রাখিয়া বসিলেন, পাঠানকে আরও কাছে আসিতে বলিলেন ও কহিলেন, “তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকেও মিত্র করা যায়, কেমন খাঁ সাহেব?”

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ হুজুর।

বসন্ত রায়। তুমি একবার রায়গড়ে যাইয়ো। আমি যশোর হইতে ফিরিয়া গিয়া তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব।

পাঠান উৎফুল্ল হইয়া কহিল, “আপনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন।” পাঠান ভাবিল একরকম বেশ গুছাইয়া লইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার সেতার বাজানো আসে?”

বসন্ত রায় কহিলেন, "হাঁ" ও তৎক্ষণাৎ সেতার তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলিতে মেজরাপ আঁটিয়া বেহাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পাঠান মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "বাহবা! খাসী!" ক্রমে উত্তেজনার প্রভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া থাকা বসন্ত রায়ের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। মর্যাদা গাম্ভীর্য আত্মপর সমস্ত বিস্মৃত হইলেন ও বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে গান ধরিলেন, "কেয়সে কাটোঙ্গী রয়ন, সো পিয়া বিনা।"

গান থামিলে পাঠান কহিল, "বাঃ কী চমৎকার আওয়াজ।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "তবে বোধ করি নিস্তব্ধ রাত্রে, খোলা মাঠে সকলের আওয়াজই মিঠা লাগে। কারণ, গলা অনেক সাধিয়াছি বটে কিন্তু লোকে আমার আওয়াজের তো বড়ো প্রশংসা করে না। তবে কী না, বিধাতা যতগুলি রোগ দিয়াছেন তাহার সকলগুলিরই একটি না একটি ঔষধ দিয়াছেন, তেমনি যতগুলি গলা দিয়াছেন তাহার একটি না একটি শ্রোতা আছেই। আমার গলাও ভালো লাগে এমন দুটি অর্বাচীন আছে। নহিলে এতদিনে সাহেব, এ গলার দোকানপাট বন্ধ করিতাম; সেই দুটো আনাড়ি খরিদ্দার আছে, মাল চিনে না, তাহাদেরই কাছ হইতে বাহবা মিলে। অনেকদিন দুটাকে দেখি নাই, গীতগানও বন্ধ আছে; তাই ছুটিয়া চলিয়াছি। মনের সাধে গান শুনাইয়া, প্রাণের বোঝা নামাইয়া বাড়ি ফিরিব।" বৃদ্ধের ক্ষীণজ্যোতি চোখদুটি স্নেহে ও আনন্দে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

পাঠান মনে মনে কহিল, "তোমার একটা সাধ মিটিয়াছে, গান শুনানো হইয়াছে, এখন প্রাণের বোঝাটা আমিই নামাইব কি? তোবা, তোবা, এমন কাজও করে! কাফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছি যে পরকালের বিষয়ে আর বড়ো ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে-প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে

এই কাফেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটা বিলিবন্দেজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল– পাঠানের নিকটবর্তী হইয়া অতি চুপি চুপি কহিলেন, “কাহাদের কথা বলিতেছিলাম, সাহেব, জান? তাহারা আমার নাতি ও নাতনী।” বলিতে বলিতে অধীর হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন– আমার অনুচরেরা কখন ফিরিয়া আসিবে? আবার সেতার লইয়া গান আরম্ভ করিলেন।

এক জন অশ্বারোহী পুরুষ নিকটে আসিয়া কহিল, “আঃ বাঁচিলাম। দাদামহাশয় পথের ধারে এত রাত্রে কাহাকে গান শুনাইতেছ?”

আনন্দে ও বিস্ময়ে বসন্ত রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেতার শিবিকা-উপরে রাখিয়া উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া নামাইলেন ও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “খবর কী দাদা? দিদি ভাল আছে তো?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “সমস্তই মঙ্গল।”

তখন বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে সেতার তুলিয়া লইলেন ও পা দিয়া তাল রাখিয়া মাথা নাড়িয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

“বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে?
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?
এখনো তো রয়েছে রাত এখনো হয় নি প্রভাত,
এখনো এ রাধিকার ফুরায় নি তো অশ্রুপাত।

চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুকাল আজ?
চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস?”

উদায়াদিত্য পাঠানের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়কে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদামহাশয়, এ কাবুলি কোথা হইতে জুটিল?”

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, “খাঁ সাহেব বড়ো ভালো লোক। সমঝদার ব্যক্তি। আজ রাত্রি বড়ো আনন্দে কাটানো গিয়াছে।”

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া খাঁ সাহেব মনে মনে বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

উদয়াদিত্য পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চটিতে না গিয়া এখানে যে?”

পাঠান সহসা বলিয়া উঠিল, “হুজুর, আশ্বাস পাই তো একটা কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা। মহারাজ আমাকে ও আমার ভাইকে আদেশ করেন যে আপনি যখন যশোহরের মুখে আসিবেন, তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।”

বসন্ত রায় চমকিয়া কহিয়া উঠিলেন, “রাম রাম রাম।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বলিয়া যাও।”

পাঠান। আমরা কখনো এমন কাজ করি নাই, সুতরাং আপত্তি করাতে তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখান। সুতরাং বাধ্য হইয়া এই কাজের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। পথের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আপনার অনুচরদের লইয়া গেলেন। আমার উপর এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তথাপি এমন কাজে আমার কোনোমতেই প্রবৃত্তি হইল না। কারণ, আমাদের কবি বলেন, রাজার আদেশে প্রভুর আদেশে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পার। কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও ধ্বংস করিয়ো না। এখন

গরিব, মহারাজের শরণাপন্ন হইল। দেশে ফিরিয়া গেলে আমার সর্বনাশ হইবে। আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।” বলিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

বসন্ত রায় অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঠানকে কহিলেন, “তোমাকে একটি পত্র দিতেছি তুমি রায়গড়ে চলিয়া যাও। আমি সেখানে ফিরিয়া গিয়া তোমার একটা সুবিধা করিয়া দিব।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “দাদামহাশয়, আবার যশোহরে যাইবে নাকি?”

বসন্ত রায় কহিলেন, “হাঁ ভাই।”

উদয়াদিত্য অবাক হইয়া কহিলেন, “সে কী কথা।”

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমার তো আর কেহ নয়, সহস্র অপরাধ করুক, সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন। আমার নিজের কোনো হানি হইবে বলিয়া ভয় করি না। আমি তো ভাই, ভবসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া; একটা ঢেউ লাগিলেই আমার সমস্ত ফুরাইল। কিন্তু এই পাপকার্য করিলে প্রতাপের ইহকালের ও পরকালের যে হানি হইত, তাহা ভাবিয়া আমি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া একবার সমস্ত বুঝাইয়া বলি।”

বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের চোখে জল আসিল। উদয়াদিত্য দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে বসন্ত রায়ের অনুচরগণ ফিরিয়া আসিল।

“মহারাজ কোথায়? মহারাজ কোথায়?”

“এইখানেই আছি বাপু, আর কোথায় যাইব?”

সকলে সমস্বরে বলিল, “সে নেড়ে বেটা কোথায়।”

বসন্ত রায় বিব্রত হইয়া মাঝে পড়িয়া কহিলেন, “হাঁ হাঁ বাপু, তোমরা খাঁ সাহেবকে কিছু বলিয়ো না।”

প্রথম। আজ মহারাজ, বড়ো কষ্ট পাইয়াছি, আজ সে–

দ্বিতীয়। তুই থাম্ না রে; আমি সমস্ত ভালো করিয়া গুছাইয়া বলি। সে পাঠান বেটা আমাদের বরাবর সোজা লইয়া গিয়া অবশেষে বাঁ-হাতি একটা আম-বাগানের মধ্যে–

তৃতীয়। না রে সেটা বাবলা বন।

চতুর্থ। সেটা বাঁ-হাতি নয় সেটা ডান-হাতি।

দ্বিতীয়। দূর খেপা, সেটা বাঁ-হাতি।

চতুর্থ। তোর কথাতেই সেটা বাঁ-হাতি?

দ্বিতীয়। বাঁ-হাতি যদি না হইবে তবে সে পুকুরটা–

উদয়াদিত্য। হাঁ বাপু, সেটা বাঁ-হাতি বলিয়া বোধ হইতেছে, তার পরে বলিয়া যাও।

দ্বিতীয়। আজ্ঞা হাঁ। সেই বাঁ-হাতি আমবাগানের মধ্য দিয়া একটা মাঠে লইয়া গেল। কত চষা মাঠ জমি জলা বাঁশঝাড় পার হইয়া গেলাম, কিন্তু গাঁয়ের নামগন্ধও পাইলাম না। এমনি করিয়া তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া গাঁয়ের কাছাকাছি হইতেই সে বেটা যে কোথায় পালাইল খোঁজ পাইলাম না।

প্রথম। সে বেটাকে দেখিয়াই আমার ভালো ঠেকে নাই।

দ্বিতীয়। আমিও মনে করিয়াছিলাম এইরকম একটা কিছু হইবেই।

তৃতীয়। যখনই দেখিয়াছি নেড়ে, তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছে।

অবশেষে সকলেই ব্যক্ত করিল যে তাহারা পূর্ব হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটা এখনও আসিল না।"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সেটা তো আর আমার দোষ নয় মহারাজ।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দোষের কথা হইতেছে না। দেরি যে হইতেছে তাহার তো একটা কারণ আছে? তুমি কী অনুমান কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

মন্ত্রী। শিমুলতলি এখান হইতে বিস্তর দূর। যাইতে, কাজ সমাধা করিতে ও ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবার কথা।

প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি চান, তিনিও যাহা অনুমান করিতেছেন, মন্ত্রীও তাহাই অনুমান করেন। কিন্তু মন্ত্রী সেদিক দিয়া গেলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "উদয়াদিত্য কাল রাত্রে বাহির হইয়া গেছে?"

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, সে তো পূর্বেই জানাইয়াছি।

প্রতাপাদিত্য। পূর্বেই জানাইয়াছি! কী উপযুক্ত সময়েই জানাইয়াছ! যে সময়ে হউক জানাইলেই বুঝি তোমার কাজ শেষ হইল? উদয়াদিত্য তো পূর্বে এমনতরো ছিল না। শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে বোধ করি তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকিবে। কী বোধ হয়?

মন্ত্রী। কেমন করিয়া বলিব মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কাছে কি আমি বেদবাক্য শুনিতে চাহিতেছি? তুমি কী আন্দাজ কর, তাই বলো না!"

মন্ত্রী। আপনি মহিষীর কাছে বধূমাতা ঠাকুরানীর কথা সমস্তই শুনিতে পান, এ-বিষয়ে আপনি অনুমান করিতে পারেন, আমি কেমন করিয়া অনুমান করিব?

এক জন পাঠান গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "কী হইল? কাজ নিকাশ করিয়াছ?"

পাঠান। হাঁ, মহারাজ, এতক্ষণে নিকাশ হইয়া গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ, জানি। কাজ নিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না।

প্রতাপাদিত্য। তবে কী করিয়া কাজ নিকাশ হইল?

পাঠান। আপনার পরামর্শ মতো আমি তাঁহার লোকজনদের তফাত করিয়াই চলিয়া আসিতেছি, হোসেন খাঁ কাজ শেষ করিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য। যদি না করিয়া থাকে?

পাঠান। মহারাজ, আমার শির জামিন রাখিলাম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, ওইখানে হাজির থাকো। তোমার ভাই ফিরিয়া আসিলে পুরস্কার মিলিবে।

পাঠান দূরে দ্বারের নিকট প্রহরীদের জিম্মায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মন্ত্রীকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "এটা যাহাতে প্রজারা কোনোমতে না জানিতে পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, অসন্তুষ্ট না হন যদি তো বলি ইহা প্রকাশ হইবেই।"

প্রতাপাদিত্য। কিসে তুমি জানিতে পারিলে?

মন্ত্রী। ইতিপূর্বে আপনি প্রকাশ্যভাবে আপনার পিতৃব্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কন্যার বিবাহের সময় আপনি বসন্ত রায়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি স্বয়ং অনিমন্ত্রিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ আপনি সহসা বিনা কারণে তাঁহাকে

নিমন্ত্রণ করিলেন ও পথের মধ্যে কে তাঁহাকে হত্যা করিল। এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এই ঘটনাটির মূল বলিয়া জানিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না মন্ত্রী। এই কথাটা প্রকাশ হইলেই তুমি যেন খুশি হও, আমার নিন্দা রটিলেই তোমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নহিলে দিনরাত্রি তুমি কেন বলিতেছ যে, কথাটা প্রকাশ হইবেই। প্রকাশ হইবার আমি তো কোনো কারণ দেখিতেছি না। বোধ করি, আর কিছুতেই সংবাদটা রাষ্ট্র না হইলে তুমি নিজে গিয়া দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে!”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, মার্জনা করিবেন। আপনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়েই অনেক ভালো বুঝেন। আপনাকে মন্ত্রণা দেওয়া আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্পর্ধার বিষয়। তবে আপনি না কি আমাকে বাছিয়া মন্ত্রী রাখিয়াছেন, এই সাহসেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় আপনাকে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকি। মন্ত্রণায় রুষ্ট হন যদি তবে এ দাসকে এ কার্যভার হইতে অব্যাহতি দিন।”

প্রতাপাদিত্য সিধা হইলেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রী যখন তাঁহাকে দুই-একটা শক্ত কথা শুনাইয়া দেন, তখন প্রতাপাদিত্য মনে মনে সন্তুষ্ট হন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আমি বিবেচনা করিতেছি, ওই পাঠান দুটাকে মারিয়া ফেলিলে এ-বিষয়ে আর কোনো ভয়ের কারণ থাকিবে না।”

মন্ত্রী কহিলেন, “একটা খুন চাপিয়া রাখাই দায়, তিনটা খুন সামলানো অসম্ভব। প্রজারা জানিতে পারিবেই।” মন্ত্রী বরাবর নিজের কথা বজায় রাখিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “তবে তো আমি ভয়ে সারা হইলাম! প্রজারা জানিতে পারিবে! যশোহর রায়গড় নহে; এখানে প্রজাদের রাজত্ব নাই। এখানে রাজা ছাড়া আর বাকি সকলেই রাজা নহে। অতএব আমাকে তুমি প্রজার ভয় দেখাইয়ো না। যদি কোনো

প্রজা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে, তবে তাহার জিহ্বা তপ্ত লৌহ দিয়া পুড়াইব।”

মন্ত্রী মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন– প্রজার জিহ্বাকে এত ভয়! তথাপি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, কোনো প্রজাকে ডরাই না!

প্রতাপাদিত্য। শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া লোকজন লইয়া একবার রায়গড়ে যাইতে হইবে। আমি ছাড়া সেখানকার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর তো কাহাকেও দেখিতেছি না।

বৃদ্ধ বসন্ত রায় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন– প্রতাপাদিত্য চমকিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, বুঝি উপদেবতা। অবাক হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বসন্ত রায় নিকটে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য। তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার অনিষ্ট করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।”

প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু কথা বানাইয়া বলিতে তিনি নিতান্ত অপটু। নিরুত্তর হইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতৃব্যকে প্রণাম করা পর্যন্ত হইল না।

বসন্ত রায় আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, “প্রতাপ, একটা যাহা হয় কথা কও। যদি দৈবাৎ এমন একটা কাজ করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা ও সংকোচ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্য ভাবিয়ো না। আমি কোনো কথা উত্থাপন করিব না। এস বৎস, দুই জনে একবার কোলাকুলি করি। আজ অনেকদিনের পর দেখা হইয়াছে; আর তো অধিক দিন দেখা হইবে না।”

এতক্ষণের পর প্রতাপাদিত্য প্রণাম করিলেন ও উঠিয়া পিতৃব্যের সহিত কোলাকুলি করিলেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেছেন। বসন্ত রায় ঈষৎ কোমল হাস্য হাসিয়া প্রতাপাদিত্যের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, “বসন্ত রায় অনেকদিন

বাঁচিয়া আছে– না প্রতাপ? সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনও যে কেন ডাক পড়িল না বিধাতা জানেন। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই।”

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর করিলেন না। বসন্ত রায় আবার কহিলেন, “তবে স্পষ্ট করিয়া সমস্ত বলি। তুমি যে আমাকে ছুরি তুলিয়াছ, তাহাতে আমাকে ছুরির অপেক্ষা অধিক বাজিয়াছে। (বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।) কিন্তু আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। আমি কেবল তোমাকে দুটি কথা বলি। আমাকে বধ করিয়ো না প্রতাপ! তাহাতে তোমার ইহকাল পরকালের ভালো হইবে না। এতদিন পর্যন্ত যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলে, তবে আর দুটা দিন পারিবে না? এইটুকুর জন্য পাপের ভাগী হইবে?”

বসন্ত রায় দেখিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর দিলেন না। দোষ অস্বীকার করিলেন না, বা অনুতাপের কথা কহিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, কহিলেন, “প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো। অনেকদিন সেখানে যাও নাই। অনেক পরিবর্তন দেখিবে। সৈন্যেরা এখন তলোয়ার ছাড়িয়া লাঙল ধরিয়াছে; যেখানে সৈন্যদের বাসস্থান ছিল সেখানে অতিথিশালা–”

এমন সময়ে প্রতাপাদিত্য দূর হইতে দেখিলেন, পাঠানটা পালাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে। আর থাকিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে যে নিরুদ্ধ রোষ ফুটিতেছিল, তাহা অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “খবরদার উহাকে ছাড়িস না। পাকড়া করিয়া রাখ্‌।” বলিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে।”

মন্ত্রী আস্তে আস্তে কহিলেন, “মহারাজ, এ-বিষয়ে আমার কোনো দোষ নাই।”

প্রতাপাদিত্য তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি কোনো বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি? আমি বলিতেছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে। সেদিন তোমার কাছে এক চিঠি রাখিতে দিলাম, তুমি হারাইয়া ফেলিলে।"

দেড় মাস পূর্বে এইরূপ একটা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন মহারাজ মন্ত্রীকে একটি কথাও বলেন নাই।

"আর-একদিন উমেশ রায়ের নিকট তোমাকে যাইতে আদেশ করিলাম, তুমি লোক পাঠাইয়া কাজ সারিলে। চুপ করো। দোষ কাটাইবার জন্য মিছামিছি চেষ্টা করিয়ো না। যাহা হউক তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছ না।"

রাজা প্রহরীদের ডাকাইলেন। পূর্বে রাত্রের প্রহরীদের বেতন কাটিয়াছিলেন, এখন তাহাদের প্রতি কারাবাসের আদেশ হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "মহিষী, রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি। উদয়াদিত্য পূর্বে তো এমন ছিল না। এখন সে যখন-তখন বাহির হইয়া যায়। প্রজাদের কাজে যোগ দেয়। আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করে। এ সকলের অর্থ কী?"

মহিষী ভীতা হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, তাহার কোনো দোষ নাই। এ সমস্ত অনর্থের মূল ওই বড়োবউ। বাছা আমার তো আগে এমন ছিল না। যেদিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেই দিন হইতে উদয় কেমন যে হইল কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

মহারাজ সুরমাকে শাসনে রাখিতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উদয়াদিত্য আসিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা, বাছা আমার রোগা কালো হইয়া গিয়াছে। বিয়ের আগে বাছার রং কেমন ছিল। যেন তপ্ত

সোনার মতো। তোর এমন দশা কে করিল? বাবা, বড়োবউ তোকে যা বলে তা শুনিস না। তার কথা শুনিয়াই তোর এমন দশা হইয়াছে।” সুরমা ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মহিষী বলিতে লাগিলেন, “ওর ছোটো বংশে জন্ম, ও কি তোর যোগ্য? ও কি তোকে পরামর্শ দিতে জানে? আমি যথার্থ কথা বলিতেছি ও কখনো তোকে ভালো পরামর্শ দেয় না, তোর মন্দ হইলেই ও যেন বাঁচে। এমন রাক্ষসীর সঙ্গেও মহারাজ তোর বিবাহ দিয়াছিলেন।” মহিষী অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়াদিত্যের প্রশান্ত ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার মনের অধীরতা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তাঁহার আয়ত নেত্র অন্যদিকে ফিরাইলেন।

এক জন পুরানো বৃদ্ধা দাসী বসিয়া ছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “শ্রীপুরের মেয়েরা জাদু জানে। নিশ্চয় বাছাকে ওষুধ করিয়াছে।” এই বলিয়া, উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বলিল, “বাবা, ও তোমাকে ওষুধ করিয়াছে। ওই যে মেয়েটি দেখিতেছ, উনি বড়ো সামান্য মেয়ে নন। শ্রীপুরের ঘরের মেয়ে। ওরা ডাইনী। আহা বাছার শরীরে আর কিছু রাখিল না।” এই বলিয়া সে সুরমার দিকে তীরের মতো এক কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও আঁচল দিয়া দুই হস্তে দুই শুষ্ক চক্ষু রগড়াইয়া লাল করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া আবার মহিষীর দুঃখ একেবারে উথলিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধাদের মধ্যে ক্রন্দনের সংক্রামকতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সকলে রানীর ঘরে আসিয়া সমবেত হইল। উদয়াদিত্য করুণনেত্রে একবার সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। ঘোমটার মধ্য হইতে সুরমা তাহা দেখিতে পাইল ও চোখ মুছিয়া একটি কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা মহিষী প্রতাপাদিত্যকে কহিলেন “আজ উদয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। বাছা আমার তেমন নহে। বুঝাইয়া বলিলে বুঝে। আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিভার ম্লান মুখ দেখিয়া সুরমা আর থাকিতে পারিল না, তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা, তুই চুপ করিয়া থাকিস কেন? তোর মনে যখন যাহা হয় বলিস না কেন?"

বিভা ধীরে ধীরে কহিল, "আমার আর কী বলিবার আছে?"

সুরমা কহিল, "অনেকদিন তাঁহাকে দেখিস নাই, তোর মন কেমন করিবেই তো! তুই তাঁহাকে আসিবার জন্য একখানা চিঠি লেখ না। আমি তোর দাদাকে দিয়া পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিব।"

বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

বিভা ঘাড় হেঁট করিয়া কহিতে লাগিল, "এখানে কেহ যদি তাঁহাকে গ্রাহ্য না করে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক বিবেচনা না করে, তবে এখানে তিনি না আসিলেই ভালো। তিনি যদি আপনি আসেন তবে আমি বারণ করিব। তিনি রাজা, যেখানে তাঁহার আদর নাই, সেখানে তিনি কেন আসিবেন? আমাদের চেয়ে তিনি কিসে ছোটো যে, পিতা তাঁহাকে অপমান করিবেন?" বলিতে বলিতে বিভা আর সামলাইতে পারিল না, তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল ও সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরমা বিভার মুখ বুকে রাখিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া কহিল, "আচ্ছা বিভা, তুই যদি পুরুষ হইতিস তো কী করিতিস? নিমন্ত্রণপত্র পাস নাই বলিয়া কি শ্বশুরবাড়ি যাইতিস না?"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না, তাহা পারিতাম না আমি যদি পুরুষ হইতাম তো এখনই চলিয়া যাইতাম; মান অপমান কিছুই ভাবিতাম না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া না ডাকিয়া অনিলে তিনি কেন আসিবেন?"

বিভা এত কথা কখনো কহে নাই। আজ আবেগের মাথায় অনেক কথা বলিয়াছে। এতক্ষণে একটু লজ্জা করিতে লাগিল। মনে হইল, বড়ো অধিক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আবার, যে রকম করিয়া বলিয়াছি, বড়ো লজ্জা করিতেছে। ক্রমে তাহার মনের উত্তেজনা হ্রাস হইয়া আসিল ও মনের মধ্যে একটা গুরুভার অবসাদ আস্তে আস্তে চাপিয়া পড়িতে লাগিল। বিভা বাহুতে মুখ ঢাকিয়া সুরমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, সুরমা মাথা নত করিয়া কোমল হস্তে তাহার ঘন কেশভার পৃথক করিয়া দিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ গেল। উভয়ের মুখে একটি কথা নাই। বিভার চোখ দিয়া এক-এক বিন্দু করিয়া জল পড়িতেছে ও সুরমা আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন বিভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ও চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ, "আজ কী ছেলেমানুষিই করিয়াছি।" ক্রমে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গিয়া পালাইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল।

সুরমা কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া রহিল। পূর্বকার কথা আর কিছু উত্থাপন না করিয়া কহিল, "বিভা শুনিয়াছিস, দাদামহাশয় আসিয়াছেন?"

বিভা। দাদামহাশয় আসিয়াছেন?

সুরমা। হাঁ।

বিভা। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কখন আসিয়াছেন?"

সুরমা। প্রায় চার প্রহর বেলার সময়।

বিভা। এখনও যে আমাদের দেখিতে আসিলেন না?

বিভার মনে ঈষৎ অভিমানের উদয় হইল। দাদামহাশয়ের দখল লইয়া বিভা অতিশয় সতর্ক। এমন কি, একদিন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া বিভাকে অন্তঃপুরে তিন দণ্ড অপেক্ষা করাইয়াছিলেন, এক বারেই তাহার সহিত দেখা করিতে যান নাই, এই জন্য বিভার এমন কষ্ট হইয়াছিল যে, যদিও সে বিষয়ে সে কিছু বলে নাই বটে তবু প্রসন্নমুখে দাদামহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারে নাই।

বসন্ত রায় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন।

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইকো সুখে থাকো,
অধিক ক্ষণ থাকব নাকো।
আসিয়াছি দুদণ্ডেরি তরে।
দেখব শুধু মুখখানি
শুনব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।"

গান শুনিয়া বিভা মুখ নত করিয়া হাসিল। তাহার বড়ো আহ্লাদ হইয়াছে। অতটা আহ্লাদ পাছে ধরা পড়ে বলিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

সুরমা বিভার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, বিভার হাসি দেখিবার জন্য তো আড়ালে যাইতে হইল না।"

বসন্ত রায়। না, বিভা মনে করিল, নিতান্তই না হাসিলে যদি বুড়া বিদায় না হয়, তবে না হয় একটু হাসি। ও ডাকিনীর মতলব আমি বেশ বুঝি, আমাকে তাড়াইবার ফন্দি। কিন্তু শীঘ্র তাহা হইতেছে না। আসিলাম যদি তো ভালো করিয়া জ্বালাইয়া যাইব, আবার যতদিন না দেখা হয় মনে থাকিবে।"

সুরমা হাসিয়া কহিল, “দেখো দাদামহাশয়, বিভা আমার কানে কানে বলিল যে, মনে রাখানোই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে যা জ্বালাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর নূতন করিয়া জ্বালাইতে হইবে না।”

কথাটা শুনিয়া বসন্ত রায়ের বড়োই আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিতে লাগিলেন।

বিভা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, “না, আমি কখনো ও কথা বলি নাই। আমি কোনো কথাই কই নাই।”

সুরমা কহিল, “দাদামহাশয়, তোমার মনস্কামনা তো পূর্ণ হইল! তুমি হাসি দেখিতে চাহিলে তাহা দেখিলে, কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে তাহাও শুনাইলাম, তবে এখন দেশান্তরে যাও।”

বসন্ত রায়। না ভাই, তাহা পারিলাম না। আমি গোটা-পনেরো গান ও একমাথা পাকা চুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।

বিভা আর থাকিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল, কহিল, “তোমার আধমাথা বই চুল নাই যে দাদামহাশয়।”

দাদামহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। অনেকদিনের পর প্রথম আলাপে বিভার মুখ খুলিতে কিছু আয়োজনের আবশ্যক করে, কিন্তু দাদামহাশয়ের কাছে বিভার মুখ একবার খুলিলে তাহা বন্ধ করিতে আবার ততোধিক আয়োজনের আবশ্যক হয়। কিন্তু দাদামহাশয় ব্যতীত আর কাহারও কাছে কোনো অবস্থাতেই বিভার মুখ খুলে না।

বসন্ত রায় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “সে একদিন গিয়াছে রে ভাই। যেদিন বসন্ত রায়ের মাথায় একমাথা চুল ছিল, সেদিন কি আর এত রাস্তা হাঁটিয়া তোমাদের খোশামোদ করিতে আসিতাম? একগাছি চুল পাকিলে তোমাদের মতো পাঁচটা

রূপসী চুল তুলিবার জন্য উমেদার হইত ও মনের আগ্রহে দশটা কাঁচা চুল তুলিয়া ফেলিত।"

বিভা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদামহাশয়, তোমার যখন একমাথা চুল ছিল, তখন কি তোমাকে এখনকার চেয়ে ভালো দেখিতে ছিল?"

মনে মনে বিভার সে-বিষয়ে বিষম সন্দেহ ছিল। দাদামহাশয়ের টাকটি, তাঁহার গুম্ফসম্পর্কশূন্য অধরের প্রশস্ত হাসিটি, তাঁহার পাকা আম্রের ন্যায় ভাবটি, সে মনে মনে পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিল, কোনোমতেই ভালো ঠেকিল না। সে দেখিল, সে টাকটি না দিলে তাহার দাদামহাশয়কে কিছুতে মানায় না। আর গোঁফ জুড়িয়া দিলে দাদামহাশয়ের মুখখানি একেবারে খারাপ দেখিতে হইয়া যায়। এত খারাপ হইয়া যায় যে, সে তাহা কল্পনা করিলে হাসি রাখিতে পারে না। দাদামহাশয়ের আবার গোঁফ! দাদামহাশয়ের আবার টাক নাই!

বসন্ত রায় কহিলেন, "সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়, তাহারা আমার চুল দেখে নাই। আমার দিদিমারা আমার চুল দেখিয়া মোহিত হইতেন, তাঁহারা আমার টাক দেখেন নাই। যাহারা উভয়ই দেখিয়াছে, তাহারা এখনও একটা মত স্থির করিতে পারে নাই।"

বিভা কহিল, "কিন্তু তা বলিয়া দাদামহাশয়, যতটা টাক পড়িয়াছে তাহার অধিক পড়িলে আর ভালো দেখাইবে না।"

সুরমা কহিল,"দাদামহাশয়, টাকের আলোচনা পরে হইবে। এখন বিভার একটা যাহা হয় উপায় করিয়া দাও।"

বিভা তাড়াতাড়ি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, আমি তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।"

সুরমা। আমি বলি কি–

বিভা। শোনো না দাদামহাশয়, তোমার–

সুরমা। বিভা চুপ কর্। আমি বলি কি, তুমি গিয়ে একবার–

বিভা। দাদামহাশয়, তোমার মাথায় পাকা চুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই, তুলে দিলে সমস্ত মাথায় টাক পড়বে।

বসন্ত রায়। আমাকে যদি কথা শুনতে না দিস দিদি, আমাকে যদি বিরক্ত করিস তবে আমি রাগ হিন্দোল আলাপ করিব।

বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন সেতারটির কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দোল রাগের উপর বিভার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল।

বিভা বলিল, "কী সর্বনাশ। তবে আমি পালাই।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সুরমা গম্ভীর হইয়া কহিল, "বিভা নীরব হইয়া দিনরাত্রি যে কষ্ট প্রাণের মধ্যে বহন করে তাহা জানিলে বোধ করি মহারাজারও মনে দয়া হয়!"

"কেন। কেন। তাহার কি হয়েছে।" বলিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত বসন্ত রায় সুরমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুরমা কহিল, "বৎসরের মধ্যে একটি দিন ঠাকুরজামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেও কাহারও মনে পড়ে না!"

বসন্ত রায় চিন্তা করিয়া কহিলেন "ঠিক কথাই তো।"

সুরমা কহিল, "স্বামীর প্রতি এ অনাদর কয়জন মেয়ে সহিতে পারে বলো তো? বিভা ভালোমানুষ, তাই কাহাকেও কিছু বলে না, আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে।"

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে?"

সুরমা। আজ বিকেলে আমার কাছে কত কাঁদিতেছিল।

বসন্ত রায়। বিভা আজ বিকালে কাঁদিতেছিল?

সুরমা। হাঁ।

বসন্ত রায়। আহা, তাহাকে একবার ডাকিয়া আনো, আমি দেখি।

সুরমা বিভাকে ধরিয়া আনিল। বসন্ত রায় তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তুই কাঁদিস কেন দিদি? যখন তোর যা কষ্ট হয় তোর দাদামহাশয়কে বলিস না কেন? তা হলে আমি আমার যথাসাধ্য করি। আমি এখনই যাই, প্রতাপকে বলিয়া আসি গে।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার বিষয়ে বাবাকে কিছু বলিয়ো না। দাদামহাশয়, তোমার পায়ে পড়ি যাইয়ো না।"

বলিতে বলিতে, বসন্ত বাহির হইয়া গেলেন; প্রতাপাদিত্যকে গিয়া বলিলেন, "তোমার জামাতাকে অনেকদিন নিমন্ত্রণ কর নাই ইহাতে তাহার প্রতি নিতান্ত অবহেলা প্রকাশ করা হইতেছে। যশোহরপতির জামাতাকে যতখানি সমাদর করা উচিত, ততখানি সমাদর যদি তাহাকে না করা হয়, তবে তাহাতে তোমারই অপমান। তাহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই।"

প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের কথায় কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। লোকসহ নিমন্ত্রণপত্র চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইবার হুকুম হইল।

অন্তঃপুরে বিভা সুরমার কাছে আসিয়া বসন্ত রায়ের সেতার বাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল। "মলিন মুখে ফুটুক হাসি জুড়াক দু-নয়ন।"

বিভা লজ্জিত হইয়া কহিল, "দাদামহাশয়, বাবার কাছে আমার কথা সমস্ত বলিয়াছ?" বসন্ত রায় গান গাহিতে লাগিলেন,

"মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।"

বিভা সেতারের তারে হাত দিয়া সেতার বন্ধ করিয়া আবার কহিল, "বাবার কাছে আমার কথা বলিয়াছ?"

এমন সময়ে উদয়াদিত্যের কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় সমরাদিত্য ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ দিদি। দাদামহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছ! আমি মাকে বলিয়া দিয়া আসিতেছি।"

"এস, এস, ভাই এস।" বলিয়া বসন্ত রায় তাহাকে পাকড়া করিলেন।

রাজপরিবারের বিশ্বাস এই যে, বসন্ত রায় ও সুরমায় মিলিয়া উদয়াদিত্যের সর্বনাশ করিয়াছে। এই নিমিত্ত বসন্ত রায় আসিলে সামাল সামাল পড়িয়া যায়। সমরাদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাহেঁচড়া আরম্ভ করিল। বসন্ত রায় তাহাকে সেতার দিয়া, তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া, তাহাকে চশমা পরাইয়া, দুই দণ্ডের মধ্যে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে, সে সমস্ত দিন দাদামহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল ও অনবরত সেতার বাজাইয়া তাঁহার সেতারের পাঁচটা তার ছিঁড়িয়া দিল ও মেজরাপ কাড়িয়া লইয়া আর দিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহার রাজকক্ষে বসিয়া আছেন। ঘরটি অষ্টকোণ। কড়ি হইতে কাপড়ে মোড়া ঝাড় ঝুলিতেছে। দেয়ালের কুলঙ্গির মধ্যে একটাতে গণেশের ও বাকিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার প্রতিমূর্তি স্থাপিত। সেগুলি বিখ্যাত কারিকর বটবৃষ্ণ কুম্ভকারের স্বহস্তে গঠিত। চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা ও একটা তাকিয়া। তাহার চারি কোণে জরির ঝালর। দেয়ালের চারিদিকে দেশী আয়না ঝুলানো, তাহাতে মুখ ঠিক দেখা যায় না। রাজার চারিদিকে যে-সকল মনুষ্য-আয়না আছে, তাহাতেও তিনি মুখ ঠিক দেখিতে পান না, শরীরের পরিমাণ অত্যন্ত বড়ো দেখায়। রাজার বাম পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড আলবোলা ও মন্ত্রী হরিশংকর। রাজার দক্ষিণে রমাই ভাঁড় ও চশমাপরা সেনাপতি ফর্নান্ডিজ।

রাজা বলিলেন, “ওহে রমাই।”

রমাই বলিল, “আজ্ঞা, মহারাজ।”

রাজা হাসিয়া আকুল। মন্ত্রী রাজার অপেক্ষা অধিক হাসিলেন। ফর্নান্ডিজ হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। সন্তোষে রমাইয়ের চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। রাজা ভাবেন, রমাইয়ের কথায় না হাসিলে অরসিকতা প্রকাশ পায়; মন্ত্রী ভাবেন, রাজা হাসিলে হাসা কর্তব্য; ফর্নান্ডিজ ভাবে, অবশ্য হাসিবার কিছু আছে। তাহা ছাড়া, যে দুর্ভাগ্য রমাই ঠোঁট খুলিলে দৈবাৎ না হাসে, রমাই তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়ে। নহিলে রমাইয়ের মান্ধাতার সমবয়স্ক ঠাট্টাগুলি শুনিয়া অল্প লোকই আমোদে হাসে। তবে ভয়ে ও কর্তব্যজ্ঞানে সকলেরই বিষম হাসি পায়, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারী পর্যন্ত।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কী হে?"

রমাই ভাবিল রসিকতা করা আবশ্যক।

"পরম্পরায় শুনা গেল সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে চোর পড়িয়াছিল।"

সেনাপতি মহাশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন একটা পুরাতন গল্প তাঁহার উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি রমাইয়ের রসিকতার ভয়ে যেমন কাতর, রমাই প্রতিবারে তেমনি তাঁহাকেই চাপিয়া ধরে। রাজার বড়োই আমোদ। রমাই আসিলেই ফর্নান্ডিজকে ডাকিয়া পাঠান। রাজার জীবনে দুইটি প্রধান আমোদ আছে; এক ভেড়ার লড়াই দেখা, আর রমাইয়ের মুখের সামনে ফর্নান্ডিজকে স্থাপন করা; রাজকার্যে প্রবেশ করিয়া অবধি সেনাপতির গায়ে একটা ছিটাগুলি বা তীরের আঁচড় লাগে নাই। অনবরত হাস্যের গোলাগুলি খাইয়া সে ব্যক্তি কাঁদো কাঁদো হইয়া আসিয়াছে। পাঠকেরা মার্জনা করিবেন, আমরা রমাইয়ের সকল রসিকতাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না, সুরুচির অনুরোধে অধিকাংশ স্থলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রাজা চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পরে?"

"নিবেদন করি মহারাজ। (ফর্নান্ডিজ তাঁহার কোর্তার বোতাম খুলিতে লাগিলেন ও পরিতে লাগিলেন।) আজ দিন তিন-চার ধরিয়া সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করিতেছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানিতে পারিয়া কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাইতে পারেন নাই।"

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

সেনাপতি। হিঃ হিঃ।

"দিনের বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সহিতে না পারিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরিব।' রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গৃহিণী বলিলেন, "ওগো চোর আসিয়াছে।' কর্তা বলিলেন, "ওই যাঃ ঘরে যে আলো জ্বলিতেছে। চোর যে আমাদের দেখিতে পাইবে ও দেখিতে পাইলেই পলাইবে।' চোরকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ তুই বড়ো বাঁচিয়া গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাইতে পারিবি, কাল আসিস দেখি, অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।"

রাজা। হা হা হা হা।

মন্ত্রী। হো হো হো হো হো।

সেনাপতি। হি।

রাজা বলিলেন, "তার পর?"

রমাই দেখিল, এখনও রাজার তৃপ্তি হয় নাই। "জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হইল না। তাহার পররাত্রেও ঘরে আসিল। গিন্নি কহিলেন, "সর্বনাশ হইল ওঠো।' কর্তা কহিলেন, "তুমি ওঠো না।' গিন্নি কহিলেন, "আমি উঠিয়া কি করিব। ' কর্তা বলিলেন, "কেন, ঘরে একটা আলো জ্বালাও না। কিছু যে দেখিতে পাই না।' গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ। কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেখো দেখি, তোমার জন্যই যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও বন্দুকটা আনো।' ইতিমধ্যে চোর কাজকর্ম সারিয়া কহিল, "মহাশয়, এক ছিলিম তামাকু খাওয়াইতে পারেন? বড়ো পরিশ্রম হইয়াছে।' কর্তা বিষম ধমক দিয়া কহিলেন, "রোস্ বেটা! আমি তামাক সাজিয়ে দিতেছি। কিন্তু আমার কাছে আসিবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়াইয়া দিব।' তামাক খাইয়া চোর কহিল, "মহাশয়, আলোটা যদি জ্বালেন তো উপকার হয়। সিঁধকাঠিটা পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।' সেনাপতি কহিলেন, "বেটার ভয় হইয়াছে। তফাতে থাক্, কাছে আসিস না।' বলিয়া

তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র বাঁধিয়া চোর চলিয়া গেল। কর্তা গিন্নিকে কহিলেন, "বেটা বিষম ভয় পাইয়াছে।' "

রাজা ও মন্ত্রী হাসি সামলাইতে পারেন না। ফর্নাণ্ডিজ থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে "হিঃ হিঃ" করিয়া টুকরো টুকরো হাসি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, শুনিয়াছ আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি?"

রমাই মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুরমন্দিরং (হাস্য। প্রথমে রাজা, পরে মন্ত্রী, পরে সেনাপতি।) কথাটা মিথ্যা নহে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশুরমন্দিরের সকলই সার,–আহারটা, সমাদরটা; দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়; সকলই সার পদার্থ; কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ওই স্ত্রীটা।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ–"

রমাই জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কহিল, "মহারাজ, তাহাকে অর্ধাঙ্গ বলিবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করিলে আমি বরঞ্চ একদিন তাহার অর্ধাঙ্গ হইতে পারিব, এমন ভরসা আছে। আমার মতো পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহার আয়তনে কুলায় না।" (যথাক্রমে হাস্য।) কথাটার রস আর সকলেই বুঝিল, কেবল মন্ত্রী পারিলেন না, এই নিমিত্ত মন্ত্রীকে সর্বাপেক্ষা অধিক হাসিতে হইল।

রাজা কহিলেন, "আমি তো শুনিয়াছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা ও ঘরকন্নায় বিশেষ পটু।"

রমাই। সে কথায় কাজ কী। ঘরে আর সকল রকম জঞ্জালই আছে, কেবল আমি তিষ্ঠিতে পারি না। প্রত্যুষে গৃহিণী এমনি ঝাঁটাইয়া দেন যে, একেবারে মহারাজের দুয়ারে আসিয়া পড়ি।

এইখানে কথাপ্রসঙ্গে রমাইয়ের ব্রাহ্মণীর পরিচয় দিই। তিনি অত্যঙ্গ কৃশাঙ্গী ও দিনে দিনে ক্রমেই আরও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। রমাই ঘরে আসিলে তিনি কোথায় যে আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া পান না। রাজসভায় রমাই একপ্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায় ও ঘরে আসিয়া গৃহিণীর কাছে আর-একপ্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায়। কিন্তু গৃহিণীর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিলে নাকি হাস্যরস না আসিয়া করুণ রস আসে, এই নিমিত্ত রাজসভায় রমাই তাহার গৃহিণীকে স্থূলকায়া ও উগ্রচণ্ডা করিয়া বর্ণনা করেন, রাজা ও মন্ত্রীরা হাসি রাখিতে পারেন না।

হাসি থামিলে রাজা কহিলেন, "ওহে রমাই, তোমাকে যাইতে হইবে, সেনাপতিকেও সঙ্গে লইব।"

সেনাপতি বুঝিলেন, এবার রমাই তাঁহার উপর দ্বিতীয় আক্রমণ করিবে। চশমাটা চোখে তুলিয়া পরিলেন এবং বোতাম খুলিতে ও পরিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "উৎসবস্থলে যাইতে সেনাপতি মহাশয়ের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ এ তো আর যুদ্ধস্থল নয়।"

রাজা ও মন্ত্রী ভাবিলেন, ভারি একটা মজার কথা আসিতেছে; আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রমাই। সাহেবের চক্ষে দিনরাত্রি চশমা আঁটা। ঘুমাইবার সময়েও চশমা পরিয়া শোন, নহিলে ভালো করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারেন না। সেনাপতি মহাশয়ের যুদ্ধে যাইতে আর কোনো আপত্তি নাই, কেবল পাছে চশমার কাঁচে কামানের গোলা লাগে ও কাঁচ ভাঙিয়া চোখ কানা হইয়া যায়, এই যা ভয়। কেমন মহাশয়?

সেনাপতি চোখ টিপিয়া কহিলেন, "তাহা নয় তো কী।" তিনি আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আদেশ করেন তো বিদায় হই।"

রাজা সেনাপতিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন, “যাত্রার সমস্ত উদ্‌যোগ করো আমার চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।” মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রস্থান করিলেন।

রাজা কহিলেন, “রমাই, তুমি তো সমস্তই শুনিয়াছ। গতবারে শ্বশুরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করিয়াছিল।”

রমাই। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের লাঙ্গুল বানাইয়া দিয়াছিল।

রাজা হাসিলেন, মুখে দন্তের বিদ্যুৎছটা বিকাশ হইল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘোরতম মেঘ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ রমাই জানিতে পারিয়াছে শুনিয়া তিনি বড়ো সন্তুষ্ট নহেন। আর কেহ জানিলে ততটা ক্ষতি ছিল না। অনবরত গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, “আপনার এক শ্যালক আসিয়া আমাকে কহিলেন, “বাসর-ঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাইয়াছে; তিনি রামচন্দ্র, না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানিতাম না।’ আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, “পূর্বে জানিবেন কিরূপে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তাই যস্মিন্‌ দেশে যদাচার অবলম্বন করিয়াছেন।’ ”

রাজা জবাব শুনিয়া বড়োই সুখী। ভাবিলেন, রমাই হইতে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল হইল ও প্রতাপাদিত্যের আদিত্য একেবারে চির-রাহুগ্রস্ত হইল। রাজা যুদ্ধবিগ্রহের বড়ো একটা ধার ধারেন না। এই সকল ছোটোখাটো ঘটনাগুলিকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহের ন্যায় বিষম বড়ো করিয়া দেখেন। এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার ঘোরতর অপমানসূচক পরাজয় হইয়াছে। এ কলঙ্কের কথা দিনরাত্রি তাঁহার মনে পড়িত ও তিনি লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিতেন। আজ তাঁহার মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল যে সেনাপতি রমাই রণে জিতিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন হইতে লজ্জার ভার একেবারে দূর হয় নাই।

রাজা রমাইকে কহিলেন, "রমাই, এবারে গিয়া জিতিয়া আসিতে হইবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার অঙ্গুরী উপহার দিব।"

রমাই বলিল, "মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ী ঠাকুরানীকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি।"

রাজা কহিলেন, "তাহার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই লইয়া যাইব।"

রমাই কহিল, "আপনার অসাধ্য কী আছে?"

রাজারও তাহাই বিশ্বাস। তিনি কী না করিতে পারেন? অনুগতবর্গের কেহ যদি বলে, "মহারাজের জয় হউক, সেবকের বাসনা পূর্ণ করুন।" মহামহিম রামচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ বলেন, "হাঁ, তাহাই হইবে।" কেহ যেন মনে না করে এমন কিছু কাজ আছে, যাহা তাঁহা দ্বারা হইতে পারে না। তিনি স্থির করিলেন, রমাই ভাঁড়কে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, স্বয়ং মহিষী-মাতার সঙ্গে বিদ্রূপ করাইবেন, তবে তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র রায়। এতবড়ো মহৎ কাজটা যদি তিনি না করিতে পারিলেন তবে আর তিনি কিসের রাজা।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামমোহন মালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামমোহন মাল পরাক্রমে ভীমের মতো ছিল। শরীর প্রায় সাড়ে চারি হাত লম্বা। সমস্ত শরীরে মাংসপেশী তরঙ্গিত। সে স্বর্গীয় রাজার আমলের লোক। রামচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতে পালন করিয়াছে। রমাইকে সকলেই ভয় করে, রমাই যদি কাহাকেও ভয় করে তো সে এই রামমোহন। রামমোহন রমাইকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। রমাই তাহার ঘৃণার দৃষ্টিতে কেমন আপনা-আপনি সংকুচিত হইয়া পড়িত। রামমোহনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে সে ছাড়িত না। রামমোহন

আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা কহিলেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশ জন অনুচর যাইবে। রামমোহন তাহাদিগের সর্দার হইয়া যাইবে।

রামমোহন কহিল, “যে আজ্ঞা। রমাই ঠাকুর যাইবেন কি?” বিড়ালচক্ষু খর্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যশোহর রাজবাটীতে আজ কর্মচারীরা ভারি ব্যস্ত। জামাতা আসিবে, নানাপ্রকার উদ্‌যোগ করিতে হইতেছে। আহারাদির বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ যশোহরের তুলনায় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সে-বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত মহিষীর কোনো মতান্তর ছিল না, তথাপি জামাতা আসিবে বলিয়া আজ তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন– বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ, সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্কা মাতার সহিত যুবতী দুহিতার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে; কিন্তু হইলে হয় কী, বিভারে কিসে ভালো হয়, মহিষী তাহা অবশ্য ভালো বুঝেন। বিভার মনে মনে ধারণা ছিল, তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত দুইখানি বড়ো মানাইবে; মহিষী তাহাকে সোনার আটগাছা মোটা চুড়ি ও হীরার এক-একগাছা বৃহদাকার বালা পরাইয়া এত অধিক আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে দেখাইবার জন্য বাড়ির সমুদয় বৃদ্ধা দাসী ও বিধবা পিসীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিভা জানিত যে তাহার ছোটো সুকুমার মুখখানিতে নথ কোনোমতেই মানায় না– কিন্তু মহিষী তাহাকে একটা বড়ো নথ পরাইয়া তাহার মুখখানি একবার দক্ষিণ পার্শ্বে একবার বাম পার্শ্বে ফিরাইয়া গর্বসহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতেও বিভা চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু মহিষী যে ছাঁদে তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহা তাহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে গোপনে সুরমার কাছে গিয়া মনের মতো চুল বাঁধিয়া আসিল। কিন্তু তাহা মহিষীর নজর এড়াইতে পারিল না। মহিষী দেখিলেন, কেবল চুল বাঁধার দোষে বিভার সমস্ত সাজ মাটি হইয়া

গিয়াছে। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা হিংসা করিয়া বিভার চুল বাঁধা খারাপ করিয়া দিয়াছে। সুরমার হীন উদ্দেশ্যের প্রতি বিভার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন। অনেকক্ষণ বকিয়া যখন স্থির করিলেন কৃতকার্য হইয়াছেন তখন তাহার চুল খুলিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে বিভা তাহার খোঁপা, তাহার নথ, তার দুই বাহুপূর্ণ চুড়ি, তাহার এক হৃদয়পূর্ণ আনন্দের ভার বহন করিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পরিয়াছে যে, দুরন্ত আহ্লাদকে কোনোমতেই সে কেবলই অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে মুখে সে কেবলই বিদ্যুতের মতো উঁকি মারিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতেছে, বাড়ির দেওয়ালগুলো পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন। বিভার হর্ষ দেখিয়া তাঁহার এমনি আনন্দ হইল যে, গৃহে গিয়া সস্নেহে মৃদু হাস্যে সুরমাকে চুম্বন করিলেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, “কী?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “কিছুই না।”

এমন সময়ে বসন্ত রায় জোর করিয়া বিভাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া হাজির করিলেন। চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, “দেখো দাদা, আজ একবার তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। সুরমা, ও সুরমা, একবার দেখে যাও।” আনন্দে গদগদ হইয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আহ্লাদ হয় তো ভালো করেই হাস না ভাই, দেখি।

হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে,
হাসির সে প্রাণের সাধ ও অধরে খেলা করে।

বয়স যদি না যাইত তো আজ তোর ঐ মুখখানি দেখিয়া এইখানে পড়িতাম আর মরিতাম। হায় হায়, মরিবার বয়স গিয়াছে। যৌবনকালে ঘড়ি ঘড়ি মরিতাম। বুড়াবয়সে রোগ না হইলে আর মরণ হয় না।”

প্রতাপাদিত্যকে যখন তাঁহার শ্যালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “জামাই বাবাজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কে গিয়াছে?” তিনি কহিলেন, “আমি কী জানি।” “আজ পথে অবশ্য আলো দিতে হইবে?” নেত্র বিস্ফারিত করিয়া মহারাজ কহিলেন, “অবশ্যই দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই।” তখন রাজশ্যালক সসংকোচে কহিলেন, “নহবত বসিবে না কি?” “সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর নাই।” আসল কথা, বাজনা বাজাইয়া একটা জামাই ঘরে আনা প্রতাপাদিত্যের কার্য নহে।

রামচন্দ্র রায়ের মহা অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক অপমান করা হইয়াছে। পূর্বে দুই-এক বার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রাজবাটী হইতে চকদিহিতে লোক প্রেরিত হইত, এবারে চাকদিহি পার হইয়া দুই ক্রোশ আসিলে পর বামনহাটিতে দেওয়ানজি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। যদি বা দেওয়ানজি আসিলেন, তাঁহার সহিত দুই শত পঞ্চাশ জন বই লোক আসে নাই। কেন, সমস্ত যশোহরে কি আর পঞ্চাশ জন লোক মিলিল না। রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়াছে রমাই ভাঁড়ের মতে স্থূলকায় দেওয়ানজি তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর। দেওয়ানকে রমাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মহাশয়, উটি বুঝি আপনার কনিষ্ঠ?” ভালোমানুষ দেওয়ানজি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিয়াছেন, “না, ওটা হাতি।”

রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া দেওয়ানকে কহিলেন, “তোমাদের মন্ত্রী যে হাতিটাতে চড়িয়া থাকে, সেটাও যে ইহা অপেক্ষা বড়ো।”

দেওয়ান কহিলেন, "বড়ো হাতিগুলি রাজকার্য উপলক্ষে দূরে পাঠানো হইয়াছে, শহরে একটিও নাই।"

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্যই তাহাদের দূরে পাঠানো হইয়াছে। নহিলে আর কী কারণ থাকিতে পারে!

রাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় আরক্তিম হইয়া শ্বশুরের নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রতাপাদিত্য রায়ের চেয়ে আমি কিসে ছোটো?"

রমাই ভাঁড় কহিল, "বয়সে আর সম্পর্কে, নহিলে আর কিসে? তাঁহার মেয়েকে যে আপনি বিবাহ করিয়াছেন ইহাতেই–"

কাছে রামমোহন মাল দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার আর সহ্য হইল না, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল "দেখো ঠাকুর, তোমার বড়ো বাড় বাড়িয়াছে। আমার মা-ঠাকরুনের কথা অমন করিয়া বলিয়ো না। এই স্পষ্ট কথা বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া রমাই কহিল, "অমন ঢের ঢের আদিত্য দেখিয়াছি। জানেন তো মহারাজ, আদিত্যকে যে-ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে– ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস।"

রাজা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। রামমোহন তখন ধীরপদক্ষেপে রাজার সম্মুখে আসিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ, ওই বামনা যে আপনার শ্বশুরের নামে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবে, ইহা তো আমার সহ্য হয় না। বলেন তো উহার মুখ বন্ধ করি।"

রাজা কহিলেন, "রামমোহন, তুই থাম্।"

তখন রামমোহন সেখান হইতে দূরে চলিয়া গেল।

রামচন্দ্র সেদিন বহু সহস্র খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছেন। অভিমানে

তিনি নিতান্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যের কাছে এমন মূর্তি ধারণ করিবেন, যাহাতে প্রতাপাদিত্য বুঝিতে পারেন তাঁহার জামাতা কতবড়ো লোক।

যখন প্রতাপাদিত্যের সহিত রামচন্দ্র রায়ের দেখা হইল, তখন প্রতাপাদিত্য রাজকক্ষে তাঁহার মন্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দেখিবামাত্রই রামচন্দ্র নতমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কিছুমাত্র উল্লাস বা ব্যস্তভাব প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে কহিলেন, "এস, ভালো আছ তো?"

রামচন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "ভাঙামাথি পরগনার তহসিলদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার কোনো তদন্ত করিয়াছ?"

মন্ত্রী দীর্ঘ এক কাগজ বাহির করিয়া রাজার হাতে দিলেন, রাজা পড়িতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর পড়িয়া একবার চোখ তুলিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত বৎসরের মতো এবার তো তোমাদের ওখানে বন্যা হয় নাই?"

রামচন্দ্র। আজ্ঞা না। আশ্বিন মাসে একবার জলবৃদ্ধি–

প্রতাপাদিত্য। মন্ত্রী এ চিঠিখানার অবশ্য একটা নকল রাখা হইয়াছে।

বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ করিয়া জামাতাকে কহিলেন, "যাও বাপু, অন্তঃপুরে যাও।"

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা প্রতাপাদিত্য কিসে বড়ো।

নবম পরিচ্ছেদ

রামমোহন মাল যখন অন্তঃপুরে আসিয়া বিভাকে প্রণাম করিয়া কহিল "মা, তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম" তখন বিভার মনে বড়ো আহ্লাদ হইল। রামমোহনকে সে বড়ো ভালোবাসিত। কুটুম্বিতার নানাবিধ কার্যভার বহন করিয়া রামমোহন প্রায় মাঝে মাঝে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে আসিত। কোনো আবশ্যক না থাকিলেও অবসর পাইলে সে এক-একবার বিভাকে দেখিতে আসিত। রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র লজ্জা করিত না। বৃদ্ধ বলিষ্ঠ দীর্ঘ রামমোহন যখন "মা" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত তখন তাহার মধ্যে এমন একটা বিশুদ্ধ সরল অলংকারশূন্য স্নেহের ভাব থাকিত যে, বিভা তাহার কাছে আপনাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিত। বিভা তাহাকে কহিল, "মোহন, তুই এতদিন আসিস নাই কেন?"

রামমোহন কহিল, "তা মা, "কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়', তুমি কোন্ আমাকে মনে করিলে? আমি মনে মনে কহিলাম, "মা না ডাকিলে আমি যাব না, দেখি, কতদিনে তাঁর মনে পড়ে।' তা কই, একবারও তো মনে পড়িল না।"

বিভা ভারি মুশকিলে পড়িল। সে কেন ডাকে নাই, তাহা ভালো করিয়া বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, ডাকে নাই বলিয়া যে মনে করে নাই, এই কথাটার মধ্যে এক জায়গায় কোথায় যুক্তির দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছে না।

বিভার মুশকিল দেখিয়া রামমোহন হাসিয়া কহিল, "না মা, অবসর পাই নাই বলিয়া আসিতে পারি নাই।"

বিভা কহিল, “মোহন, তুই ব’স্; তোদের গল্প আমায় বল্।”

রামমোহন বসিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা করিতে লাগিল। বিভা গালে হাত দিয়া একমনে শুনিতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদয়টুকুর মধ্যে কত কী কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন সে আসমানের উপর কত ঘরবাড়িই বাঁধিয়াছিল তাহার আর ঠিকানা নাই। যখন রামমোহন গল্প করিল গত বর্ষার বন্যায় তাহার ঘরবাড়ি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী তাহার বৃদ্ধ মাতাকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়াছিল ও দুই জনে মিলিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে যাপন করিয়াছিল তখন বিভার ক্ষুদ্র বুকটির মধ্যে কী হৃৎকম্পই উপস্থিত হইয়াছিল।

গল্প ফুরাইলে পর রামমোহন কহিল, “মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা আনিয়াছি, তোমাকে ঐ হাতে পরিতে হইবে, আমি দেখিব।”

বিভা তাহার চারগাছি সোনার চুড়ি খুলিয়া শাঁখা পরিল ও হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া কহিল, “মা, মোহন তোমার চুড়ি খুলিয়া আমাকে চারগাছি শাঁখা পরাইয়া দিয়াছে।”

মহিষী কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিয়া কহিলেন, “তা বেশ তো সাজিয়াছে, বেশ তো মানাইয়াছে।”

রামমোহন অত্যন্ত উৎসাহিত ও গর্বিত হইয়া উঠিল। মহিষী তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে আহার করাইলেন। সে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিলে পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “মোহন, এইবারে তোর সেই আগমনীর গানটি গা।” রামমোহন বিভার দিকে চাহিয়া গাহিল,

“সারা বরষ দেখি নে মা, মা তুই আমার কেমনধারা,
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা।
এলি কি পাষাণী ওরে

দেখব তোরে আঁখি ভরে
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।”

রামমোহনের চোখে জল আসিল, মহিষীও বিভার মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল মুছিলেন। আগমনীর গানে তাঁহার বিজয়ার কথা মনে পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পুরমহিলাদের জনতা বাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা জামাই দেখিবার জন্য ও সম্পর্ক অনুসারে জামাইকে উপহাস করিবার জন্য অন্তঃপুরে সমাগত হইল। আনন্দ, লজ্জা, আশঙ্কা, একটা অনিশ্চিত অনির্দেশ্য না-জানি-কী-হইবে ভাবে বিভার হৃদয় তোলপাড় করিতেছে, তাহার মুখ-কান লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত-পা শীতল হইয়া গিয়াছে। ইহা কষ্ট কি সুখ কে জানে!

জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। হুলবিশিষ্ট সৌন্দর্যের ঝাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে হাসির কোলাহল উঠিল। চারিদিক হইতে কোকিল-কণ্ঠের তীব্র উপহাস, মৃণাল-বাহুর কঠোর তাড়ন, চম্পক-অঙ্গুলির চন্দ্র-নখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একজন প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিল। সে কঠোর কণ্ঠে এমনি কাটা কাটা কথা কহিতে লাগিল ও ক্রমেই তাহার মুখ দিয়া এমনি সকল রুচির বিকার বাহির হইতে লাগিল যে পুররমণীদের মুখ একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখের কাছে থাকোদিদিও চুপ করিয়া গেলেন। বিমলাদিদি ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভুতোর মা তাহাকে খুব এক কথা শুনাইয়াছিল। যখন উল্লিখিত ভুতোর মার মুখ খুব চলিতেছিল, তখন সেই প্রৌঢ়া তাহাকে বলিয়াছিল, “মাগো মা, তোমার মুখ নয় তো, একগাছা ঝাঁটা।” ভুতোর মা তৎক্ষণাৎ কহিল, “আর মাগি, তোর মুখটা

আঁস্তাকুড়, এত ঝাঁটাইলাম তবুও সাফ হইল না।" বলিয়া গস গস করিয়া চলিয়া গেল। একে একে ঘর খালি হইল, রামচন্দ্র রায় বিরাম পাইলেন।

তখন সেই প্রৌঢ়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহিষীর কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে মহিষী দাসদাসীদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। রামমোহনও একপার্শ্বে বসিয়া খাইতেছিল। সেই প্রৌঢ়া মহিষীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "এই যে নিকষা জননী।" শুনিবামাত্র রামমোহন চমকিয়া উঠিল, প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া শার্দূলের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি যে ঠাকুর তোমায় চিনি।" বলিয়া তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল। আর কেহ নহে, রমাই ঠাকুর। রামমোহন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, গাত্র হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিল; দুই হস্তে অবলীলাক্রমে রমাইকে আকাশে তুলিল, কহিল, "আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে।" বলিয়া তাহাকে দুই-এক পাক আকাশে ঘুরাইল। মহিষী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "রামমোহন তুই করিস কী?" রমাই কাতর স্বরে কহিল, "দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা করিস না।" চারিদিক হইতে বিষম একটা গোলযোগ উঠিল। তখন রামমোহন রমাইকে ভূমিতে নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "হতভাগা, তোর কি আর মরিবার জায়গা ছিল না?"

রমাই কহিল, "মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন।" রামমোহন বলিয়া উঠিল, "কী বলিলি, নিমকহারাম? ফের অমন কথা বলিবি তো এই শানের পাথরে তোর মুখ ঘষিয়া দিব।" বলিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

রমাই আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন রামমোহন খর্বকায় রমাইকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া বস্তার মতন করিয়া ঝুলাইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা অনেকটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার শ্যালক আসিয়া সেই রাত্রে প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দিলেন যে, জামাতা রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে লইয়া গেছেন। সেখানে সে পুররমণীদের সহিত, এমন কি, মহিষীর সহিত বিদ্রূপ করিয়াছে।

তখন প্রতাপাদিত্যের মূর্তি অতিশয় ভয়ংকর হইয়া উঠিল। রোষে তাঁহার সর্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্ফীতজটা সিংহের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "লছমন সর্দারকে ডাকো।" লছমন সর্দারকে কহিলেন, "আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে চাই।" সে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া কহিল, "যো হুকুম মহারাজ।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্যালক তাঁহার পদতলে পড়িল, কহিল, "মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করিবেন না।" প্রতাপাদিত্য পুনরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আজ রাত্রের মধ্যেই আমি রামচন্দ্র রায়ের মুণ্ড চাই।" তাঁহার শ্যালক তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মহারাজ, আজ তাঁহারা অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, মার্জনা করুন, মহারাজ, মার্জনা করুন।" তখন প্রতাপাদিত্য কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "লছমন, শুন, কাল প্রভাতে যখন রামচন্দ্র রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবে তখন তাহাকে বধ করিবে, তোমার উপর আদেশ রহিল।" শ্যালক দেখিলেন, তিনি যত-দূর মনে করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিলেন।

তখন দূর হইতে দুই প্রহরের নহবত বাজিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে নেই নহবতের শব্দ জ্যোৎস্নার সহিত দক্ষিণা বাতাসের সহিত মিশিয়া ঘুমন্ত প্রাণের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। বিভার শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্র রায় নিদ্রায় মগ্ন। বিভা উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া গালে হাত

দিয়া ভাবিতেছে। জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া দুই-এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। বুঝি যেমনটি কল্পনা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি হয় নাই। তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিতেছিল। এতদিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সে দিন তো আজ আসিয়াছে।

রামচন্দ্র রায় শয্যায় শয়ন করিয়া অবধি বিভার সহিত একটি কথা কন নাই। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছে– তিনি প্রতাপাদিত্যকে অপমান করিবেন কী করিয়া? না, বিভাকে অগ্রাহ্য করিয়া। তিনি জানাইতে চান, "তুমি তো যশোহরের প্রতাপাদিত্যের মেয়ে, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে?' এই স্থির করিয়া সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন আর পার্শ্ব পরিবর্তন করেন নাই। যত মান-অভিমান সমস্তই বিভার প্রতি। বিভা জাগিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। একবার জ্যোৎস্নার দিকে চাহিতেছে, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক-একবার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতেছে– প্রাণের মধ্যে বড়ো ব্যথা বাজিয়াছে। সহসা একবার রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সহসা দেখিলেন, বিভা চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। সেই নিদ্রোত্থিত অবস্থার প্রথম মুহূর্তে যখন অপমানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে নাই, গভীর নিদ্রার পরে মনের সুস্থ ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, রোষের ভাব চলিয়া গিয়াছে, তখন সহসা বিভার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ কচি মুখখানি দেখিয়া সহসা তাঁহার মনে করুণা জাগিয়া উঠিল। বিভার হাত ধরিয়া কহিলেন, "বিভা, কাঁদিতেছ?" বিভা আকুল হইয়া উঠিল। বিভা কথা কহিতে পারিল না, বিভা চোখে দেখিতে পাইল না, বিভা শুইয়া পড়িল। তখন রামচন্দ্র রায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বিভার মাথাটি লইয়া কোলের উপর রাখিলেন, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। এমন সময়ে দ্বারে কে আঘাত করিল। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "কে ও?" বাহির হইতে উত্তর আসিল, "অবিলম্বে দ্বার খোলো।"

দশম পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় শয়নকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশ্যালক রমাপতি কহিলেন, "বাবা, এখনই পালাও, মুহূর্ত বিলম্ব করিয়ো না।"

সেই রাত্রে সহসা এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র রায় একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গেল, রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন, কী হইয়াছে?"

"কী হইয়াছে তাহা বলিব না, এখনই পালাও।"

বিভা শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কী হইয়াছে?"

রমাপতি কহিলেন, "সে-কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই, মা।"

বিভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে একবার বসন্ত রায়ের কথা ভাবিল, একবার উদয়াদিত্যের কথা ভাবিল। বলিয়া উঠিল, "মামা, কী হইয়াছে বলো।"

রমাপতি তাহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বাবা, অনর্থক কালবিলম্ব হইতেছে। এই বেলা গোপনে পালাইবার উপায় দেখো।"

হঠাৎ বিভার মনে একটা দারুণ অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। গমনোদ্যত মাতুলের পথরোধ করিয়া কহিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কী হইয়াছে বলিয়া যাও।"

রমাপতি সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, "গোল করিস নে বিভা চুপ কর্, আমি সমস্তই বলিতেছি।"

যখন রমাপতি একে একে সমস্তটা বলিলেন, তখন বিভা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। রমাপতি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন– কহিলেন, "চুপ, চুপ, সর্বনাশ করিস নে।" বিভা রুদ্ধশ্বাসে অর্ধরুদ্ধস্বরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

রামচন্দ্র রায় সকাতরে কহিলেন, “এখন আমি কী উপায় করিব? পালাইবার কী পথ আছে, আমি তো কিছুই জানি না।”

রমাপতি কহিলেন, “আজ রাত্রে প্রহরীরা চারিদিকে সতর্ক আছে। আমি একবার চারিদিকে দেখিয়া আসি যদি কোথাও কোনো উপায় থাকে।”

এই বলিয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। বিভা তাঁহাকে ধরিয়া কহিল, “মামা, তুমি কোথায় যাও। তুমি যাইয়ো না, তুমি আমাদের কাছে থাকো।”

রমাপতি কহিলেন, “বিভা, তুই পাগল হইয়াছিস। আমি কাছে থাকিলে কোনো উপকার দেখিবে না। ততক্ষণ আমি একবার চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া আসি।”

বিভা তখন বলপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত-পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। কহিল, “মামা, তুমি আর-একটু এইখানে থাকো। আমি একবার দাদার কাছে যাই।” বলিয়া বিভা তাড়াতাড়ি উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত যায় যায়। চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কোথাও সাড়াশব্দ নাই। রামচন্দ্র রায় তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন দুই পার্শ্বে রাজ-অন্তঃপুরের শ্রেণীবদ্ধ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ, সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুমাইতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চারিদিকের ভিত্তির ছায়া পড়িয়াছে ও তাহার এক পার্শ্বে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে। ক্রমে সেটুকুও মিলাইয়া গেল। অন্ধকার এক পা এক পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোল ঘেঁষিয়া অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রামচন্দ্র রায় কল্পনা করিতে লাগিলেন, এই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে না জানি কোথায় একটা ছুরি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দক্ষিণে না বামে, সম্মুখে না পশ্চাতে? ওই যে ইতস্তত এক-একটা কোণ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে একটা কোণে

তো কেহ মুখ গুঁজিয়া, সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই? কী জানি ঘরের মধ্যে যদি কেহ থাকে। খাটের নিচে, অথবা দেয়ালের এক পাশে। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কপাল দিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। একবার মনে হইল যদি মামা কিছু করেন, যদি তাঁহার কোনো অভিসন্ধি থাকে? আস্তে আস্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বাতাস আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল। রামচন্দ্র ভাবিলেন, কে এক জন বুঝি প্রদীপ নিবাইয়া দিল– কে এক জন বুঝি ঘরে আছে। রমাপতির কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া ডাকিলেন, "মামা।" মামা কহিলেন, "কী বাবা?" রামচন্দ্র রায় মনে মনে কহিলেন, বিভা কাছে থাকিলে ভালো হইত, মামাকে ভালো বিশ্বাস হইতেছে না।

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সুরমা তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইয়াছে, বিভা?" বিভা সুরমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। উদয়াদিত্য সস্নেহে বিভার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "কেন বিভা, কী হইয়াছে?" বিভা তাহার ভ্রাতার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, আমার সঙ্গে এস, সমস্ত শুনিবে।"

তিন জনে মিলিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ধকারে রামচন্দ্র বসিয়া ও রমাপতি দাঁড়াইয়া আছেন। উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, হইয়াছে কী?" রমাপতি একে একে সমস্তটা কহিলেন। উদয়াদিত্য তাঁহার আয়ত নেত্র বিস্ফারিত করিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি এখনই পিতার কাছে যাই–তাঁহাকে কোনোমতেই আমি ও-কাজ করিতে দিব না। কোনোমতেই না।"

সুরমা কহিল, "তাহাতে কি কোনো ফল হইবে? তাহার চেয়ে বরং একবার দাদামহাশয়কে তাঁহার কাছে পাঠাও, যদি কিছু উপকার দেখে।"

যুবরাজ কহিলেন, "আচ্ছা।"

বসন্ত রায় তখন অগাধ নিদ্রা দিতেছিলেন। ঘুম ভাঙিয়াই উদয়াদিত্যকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভোর হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ললিতে একটা গান গাহিবার উপক্রম করিলেন,

"কবরীতে ফুল শুকাল, কাননের ফুল ফুটল বনে,
দিনের আলো প্রকাশিল, মনের সাধ রহিল মনে।"

উদয়াদিত্য বলিলেন, "দাদামহাশয়, বিপদ ঘটিয়াছে।"

তৎক্ষণাৎ বসন্ত রায়ের গান বন্ধ হইয়া গেল। ত্রস্তভাবে উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যাঁ। সে কী দাদা। কী হইয়াছে। কিসের বিপদ।"

উদয়াদিত্য সমস্ত বলিলেন। বসন্ত রায় শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না দাদা না, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আর সময় নাই, একবার পিতার কাছে যাও।"

বসন্ত রায় উঠিলেন, চলিলেন, যাইতে যাইতে কতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা প্রতাপ, এ কি কখনো সম্ভব?" প্রতাপাদিত্য এখনও শয়নকক্ষে যান নাই– তিনি তাঁহার মন্ত্রগৃহে বসিয়া আছেন। এক বার এক মুহূর্তের জন্য মনে হইয়াছিল লছমন সর্দারকে ফিরিয়া ডাকিবেন। কিন্তু সে সংকল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য কখনো দুইবার আদেশ করেন? যে মুখে আদেশ দেওয়া সেই মুখে আদেশ ফিরাইয়া লওয়া? আদেশ লইয়া ছেলেখেলা করা তাঁহার কার্য নহে। কিন্তু বিভা? বিভা বিধবা হইবে। রামচন্দ্র রায় যদি স্বেচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে ঝাঁপ দিত, তাহা হইলেও তো বিভা বিধবা হইত। রামচন্দ্র রায়

প্রতাপাদিত্য রায়ের রোষাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্বক ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ বিভা বিধবা হইবে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের কী হাত আছে। কিন্তু এত কথাও তাঁহার মনে হয় নাই। মাঝে মাঝে যখনই সমস্ত ঘটনা উজ্জ্বলরূপে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে তখনই তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন, রাত কখন পোহাইবে? ঠিক এমন সময় বৃদ্ধ বসন্ত রায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ও আকুল ভাবে প্রতাপাদিত্যের দুই হাত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, ইহা কি কখনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন সম্ভব নয়?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?"

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেমানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, ইহা বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই! ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া নির্বোধ মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখাইয়া যে রোজগার করিয়া খায়, তাহাকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করিবার জন্য আনিয়াছে,–এতটা বুদ্ধি যাহার জোগাইতে পারে, তাহার ফল কী হইতে পারে, সে-বুদ্ধিটা আর তাহার মাথায় জোগাইল না। দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাইবে, তখন তাহার মাথাও তাহার শরীরে থাকিবে না।" যতই বলিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর আরো কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতা আরো বাড়িয়া উঠিল।

বসন্ত রায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আহা সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই বুঝে না।"

প্রতাপাদিত্যের অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোহরে রায়-বংশের কিসে মান-অপমান হয় সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ওই পাকা চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার। বাদশাহের প্রসাদগর্বে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে।

যবন-চরণের মৃত্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া থাকো। তোমার ওই যবনের পদধূলিময় অকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল। এই তোমাকে স্পষ্টই বলিলাম। তুমি বলিয়াই বুঝিলে না, আজ রায়-বংশের কতবড়ো অপমান হইয়াছে, তুমি বলিয়াই আজ রায়-বংশের অপমানকারীর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ।"

বসন্ত রায় তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রতাপ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে ছুরি এক জনের উপর পড়িতেই চায়। আমি তাহার লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িলাম বলিয়া আর-এক জন তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। ভালো প্রতাপ, তোমার মনে যদি দয়া না থাকে, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ এক জনকে যদি গ্রাস করিতেই চায়, তবে আমাকেই করুক। এই তোমার খুড়ার মাথা (বলিয়া বসন্ত রায় মাথা নিচু করিয়া দিলেন)। ইহা লইয়া যদি তোমার তৃপ্তি হয় তবে লও। ছুরি আনো। এ মাথায় চুল নাই, এ মুখে যৌবনের রূপ নাই। যম নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছে, সে সভার উপযোগী সাজসজ্জাও শেষ হইয়াছে। (বসন্ত রায়ের মুখে অতি মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল।) কিন্তু ভাবিয়া দেখো প্রতাপ, বিভা আমাদের দুধের মেয়ে, তার যখন দুটি চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িবে তখন–" বলিতে বলিতে বসন্ত রায় অধীর উচ্ছ্বাসে একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন, "আমাকে শেষ করিয়া ফেলো প্রতাপ। আমার বাঁচিয়া সুখ নাই। তাহার চোখে জল দেখিবার আগে আমাকে শেষ করিয়া ফেলো।"

প্রতাপাদিত্য এত ক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। যখন বসন্ত রায়ের কথা শেষ হইল তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন কথাটা প্রকাশ হইয়াছে। নিচে গিয়া প্রহরীদের ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, রাজপ্রাসাদসংলগ্ন খাল এখনই যেন বড়ো বড়ো শালকাঠ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেই খালে রামচন্দ্র রায়ের নৌকা আছে।

প্রহরীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কেহ যেন বাহির হইতে না পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় যখন অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিভা একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। বসন্ত রায় আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি ইহার একটা উপায় করিয়া দাও।" রামচন্দ্র রায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন উদয়াদিত্য তাঁহার তরবারি হস্তে লইলেন, "এস আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।" সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিভা, তুই এখানে থাক্, তুই আসিস নে।" বিভা শুনিল না। রামচন্দ্র রায়ও কহিলেন, "না, বিভা সঙ্গে সঙ্গেই আসুক।" সেই নিস্তব্ধ রাত্রে সকলে পা টিপিয়া চলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, বিভীষিকা চারিদিক হইতে তাহার অদৃশ্য হস্ত প্রসারিত করিতেছে। রামচন্দ্র রায় সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মামার প্রতি মাঝে মাঝে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া বহির্দেশে যাইবার দ্বারে আসিয়া উদয়াদিত্য দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। বিভা ভয়কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দাদা, নিচে যাইবার দরজা হয়তো বন্ধ করে নাই। সেইখানে চলো।" সকলে সেই দিকে চলিল। দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিচে চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায়ের মনে হইল, এ সিঁড়ি দিয়া নামিলে বুঝি আর কেহ উঠে না, বুঝি বাসুকি-সাপের গর্তটা এইখানে, পাতালে নামিবার সিঁড়ি এই। সিঁড়ি ফুরাইলে দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। আবার সকলে ধীরে ধীরে উঠিল। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার যতগুলি পথ আছে সমস্তই বন্ধ। সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেক দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই-তিন বার করিয়া গেল। সকলগুলিই বন্ধ।

যখন বিভা দেখিল, বাহির হইবার কোনো পথই নাই, তখন সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল। দৃঢ়পদে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, "দেখিব, এ ঘর হইতে তোমাকে কে বাহির করিয়া লইতে পারে। তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার আগে আগে যাইব, দেখিব আমাকে কে বাধা দেয়।"

উদয়াদিত্য দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমাকে বধ না করিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" সুরমা কিছু না বলিয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের এ বন্দোবস্ত কিছুতেই ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছেন, "প্রতাপাদিত্য যে-রকম লোক দেখিতেছি তিনি কী না করিতে পারেন। বিভা ও উদয়াদিত্য যে মাঝে পড়িয়া কিছু করিতে পারিবেন, এমন ভরসা হয় না। এ বাড়ি হইতে কোনোমতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি।"

কিছুক্ষণ বাদে সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "আমাদের এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে কোনো ফল হইবে তাহা তো বোধ হয় না, বরং উল্‌টা। পিতা যতই বাধা পাইবেন, ততই তাঁহার সংকল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোনোমতে প্রাসাদ হইতে পালাইবার উপায় করিয়া দাও।"

উদয়াদিত্য চিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তবে আমি যাই, বলপ্রয়োগ করিয়া দেখি গে।"

সুরমা দৃঢ়ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "যাও।"

উদয়াদিত্য তাঁহার উত্তরীয় বসন ফেলিয়া দিলেন, চলিলেন। সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেল। নিভৃত স্থানে গিয়া সে উদয়াদিত্যের বক্ষ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। উদয়াদিত্য শির নত করিয়া তাহাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন করিলেন ও মুহূর্তের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন

সুরমা তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। জোড়হস্তে কহিল, "মাগো, যদি আমি পতিব্রতা সতী হই, তবে এবার আমার স্বামীকে তাঁহার পিতার হাত হইতে রক্ষা করো। আমি যে তাঁহাকে আজ এই বিপদের মধ্যে বিদায় দিলাম, সে কেবল তোর ভরসাতেই মা। তুই যদি আমাকে বিনাশ করিস, তবে পৃথিবীতে তোকে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা সেই অন্ধকারে বসিয়া কতবার মনে মনে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু মনে হইল যেন মা তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না। মনে মনে তাঁহার পায়ে যে পুষ্পাঞ্জলি দিল মনে হইল যেন তিনি তাহা লইলেন না, তাঁহার পা হইতে পড়িয়া গেল। সুরমা কাঁদিয়া কহিল, "কেন মা, আমি কী করিয়াছি?" তাহার উত্তর শুনিতে পাইল না। সে সেই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইল, প্রলয়ের মূর্তি নাচিতেছে। সুরমা চারিদিকে শূন্যময় দেখিতে লাগিল। সে একাকী সে-ঘরে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া বিভার ঘরে আসিল।

বসন্ত রায় কাতর স্বরে কহিলেন, "দাদা এখনো ফিরিল না, কী হইবে?"

সুরমা দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিধাতা যাহা করেন।"

রামচন্দ্র রায় তখন মনে মনে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য রামমোহনের সর্বনাশ করিতে ছিলেন। কেন না, তাহা হইতেই এই সমস্ত বিপদ ঘটিল। তাহার যতপ্রকার শাস্তি সম্ভব তাহার বিধান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক একবার চৈতন্য হইতেছে যে, শাস্তি দিবার বুঝি আর অবসর থাকিবে না।

উদয়াদিত্য তরবারী হস্তে অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া রুদ্ধ দ্বারে গিয়া সবলে পদাঘাত করিলেন– কহিলেন, "কে আছিস?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আজ্ঞা, আমি সীতারাম।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "শীঘ্র দ্বার খোলো।"

সে অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। উদয়াদিত্য চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সে জোড়হস্তে কহিল, "যুবরাজ মাপ করুন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কাহারও বাহির হইবার হুকুম নেই।"

যুবরাজ কহিলেন, "সীতারাম, তবে কি তুমিও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে? আচ্ছা তবে এস।" বলিয়া অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

সীতারাম জোড়হস্তে কহিলেন, "না যুবরাজ, আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না, আপনি দুইবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।" বলিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবরাজ কহিলেন, "তবে কী করিতে চাও শীঘ্র করো, আর সময় নাই।"

সীতারাম কহিল, "যে প্রাণ আপনি দুইবার রক্ষা করিয়াছেন, এবার তাহাকে বিনাশ করিবেন না। আমাকে নিরস্ত্র করুন। এই লউন আমার অস্ত্র। আমাকে আপাদমস্তক বন্ধন করুন। নহিলে মহারাজের নিকট কাল আমার রক্ষা নাই।"

যুবরাজ তাহার অস্ত্র লইলেন, তাহার কাপড় দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সে সেইখানে পড়িয়া রহিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া একটা অনতিউচ্চ প্রাচীরের মতো আছে। সে প্রাচীরের একটিমাত্র দ্বার, সে দ্বারও রুদ্ধ। সেই দ্বার অতিক্রম করিলেই একেবারে অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া যায়। যুবরাজ দ্বারে আঘাত না করিয়া একেবারে প্রাচীরের উপর লাফ দিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, এক জন প্রহরী প্রাচীরে ঠেসান দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছে। অতি সাবধানে তিনি নামিয়া পড়িলেন। বিদ্যুদ্বেগে সে নিদ্রিত প্রহরীর উপর গিয়া পড়িলেন। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও সেই হতবুদ্ধি অভিভূত প্রহরীকে আপাদমস্তক বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার কাছে চাবি ছিল, সেই

চাবি কাড়িয়া লইয়া দ্বার খুলিলেন। তখন প্রহরীর চৈতন্য হইল, বিস্মিত স্বরে কহিল, "যুবরাজ, করেন কী?"

যুবরাজ কহিলেন, "অন্তঃপুরের দ্বার খুলিতেছি।"

প্রহরী কহিল, "কাল মহারাজের কাছে কী জবাব দিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বলিস, যুবরাজ বলপূর্বক আমাদিগকে পরাভূত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়াছেন। তাহা হইলে খালাস পাইবি।"

উদয়াদিত্য অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যে-ঘরে জামাতার লোকজন থাকে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে কেবল রামমোহন ও রমাই ভাঁড় ঘুমাইতেছিল, আর বাকি সকলে আহারাদি করিয়া নৌকায় গিয়াছে। যুবরাজ, ধীরে ধীরে রামমোহনকে স্পর্শ করিলেন। সে চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কী? যুবরাজ?" যুবরাজ কহিলেন, "বাহিরে এস।" রামমোহন বাহিরে আসিল। রামমোহনকে যুবরাজ সমস্ত কহিলেন।

তখন রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিল, ক্রোধে স্ফীত হইয়া কহিল, "দেখিব লছমন সর্দার কতবড়ো লোক। যুবরাজ, আমাদের মহারাজকে একবার কেবল আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি একা এই লাঠি লইয়া এক-শ জন লোক ভাগাইতে পারি।"

যুবরাজ কহিলেন, "সে-কথা আমি মানি, কিন্তু যশোহরের রাজপ্রাসাদে এক শত অপেক্ষা অনেক অধিক লোক আছে। তুমি বলপূর্বক কিছু করিতে পারিবে না। অন্য কোনো উপায় দেখিতে হইবে।"

রামমোহন কহিল, "আচ্ছা, মহারাজকে একবার আমার কাছে আনুন, আমার পাশে তিনি দাঁড়াইলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উপায় ভাবিতে পারি।" তখন অন্তঃপুরে গিয়া উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গে সকলেই আসিল।

রামচন্দ্র রামমোহনকে দেখিয়াই ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "তোকে আমি এখনি ছাড়াইয়া দিলাম, তুই দূর হইয়া যা। তুই পুরানো লোক, তোকে আর অধিক কী শাস্তি দিব। যদি এ-যাত্রা বাঁচিয়া যাই তবে তোর মুখ আর আমি দেখিব না।" বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি যথার্থই রামমোহনকে ভালোবাসিতেন, শিশুকাল হইতে রামমোহন তাঁহাকে পালন করিয়া আসিতেছে।

রামমোহন জোড়হাত করিয়া কহিল, "তুমি আমাকে ছাড়াইবার কে, মহারাজ? আমার এ চাকরি ভগবান দিয়াছেন। যেদিন যমের তলব পড়িবে, সেদিন ভগবান আমার এ চাকরি ছাড়াইবেন। তুমি আমাকে রাখ না রাখ আমি তোমার চাকর।" বলিয়া সে রামচন্দ্রকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "রামমোহন, কী উপায় করিলে?" রামমোহন কহিল, "আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে এই লাঠিই উপায়। আর মা কালীর চরণ ভরসা।"

উদয়াদিত্য ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ও উপায় কোনো কাজের নয়। আচ্ছা রামমোহন, তোমাদের নৌকা কোন্ দিকে আছে?"

রামমোহন কহিলেন, "রাজবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বের খালে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "চলো একবার ছাদে যাই।"

রামমোহনের মাথায় হঠাৎ একটা উপায় উদ্ভাবিত হইল– সে কহিল, "হাঁ, ঠিক কথা, সেইখানে চলুন।"

সকলে প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। ছাদ ইহতে প্রায় সত্তর হাত নিচে খাল। সেই খালে রামচন্দ্রের চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা ভাসিতেছে। রামমোহন কহিল, রামচন্দ্র রায়কে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া সে সেইখানে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হইয়া রামমোহনকে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না না, সে কি হয়? রামমোহন, তুমি অমন অসম্ভব কাজ করিতে যাইয়ো না।"

বিভা চমকিয়া সত্রাসে বলিয়া উঠিল, "না মোহন, তুই ও কী বলিতেছিস।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "না রামমোহন, তাহা হইবে না।"

তখন উদয়াদিত্য অন্তঃপুরে গিয়া কতকগুলা খুব মোটা বৃহৎ চাদর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রামমোহন সেগুলি পাকাইয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড রজ্জুর মতো প্রস্তুত করিল। যেদিকে নৌকা ছিল, সেইদিককার ছাদের উপরের একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভের সহিত রজ্জু বাঁধিল। রজ্জু নৌকার কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে গিয়া শেষ হইল। রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে কহিল, "মহারাজ, আপনি আমার পিঠ জড়াইয়া ধরিবেন, আমি রজ্জু বাহিয়া নামিয়া পড়িব।" রামচন্দ্র তাহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। তখন রামমোহন সকলকে একে একে প্রণাম করিল ও সকলের পদধূলি লইল, কহিল, "জয় মা কালী।" রামচন্দ্রকে পিঠে তুলিয়া লইল, রামচন্দ্র চোখ বুঁজিয়া প্রাণপণে তাহার পিঠ আঁকড়িয়া ধরিলেন। বিভার দিকে চাহিয়া রামমোহন কহিল, "মা, তবে আমি চলিলাম। তোমার সন্তান থাকিতে কোনো ভয় করিয়ো না।"

রামমোহন রজ্জু আঁকড়িয়া ধরিল। বিভা স্তম্ভে ভর দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় কম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া চোখ বুঁজিয়া "দুর্গা" "দুর্গা" জপিতে লাগিলেন। রামমোহন রজ্জু বাহিয়া নামিয়া রজ্জুর শেষ প্রান্তে গেল। তখন সে হাত ছাড়িয়া দাঁত দিয়া রজ্জু কামড়াইয়া ধরিল ও রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠ হইতে ছাড়াইয়া দুই হস্তে ঝুলাইয়া অতি

সাবধানে নৌকায় নামাইয়া দিল ও নিজেও লাফাইয়া পড়িল। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন অমনি মূর্ছিত হইলেন। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন, অমনি বিভা গভীর ও সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বসন্ত রায় চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা, কী হইল?” উদয়াদিত্য মূর্ছিত বিভাকে সস্নেহে কোলে করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, “এখন তোমার কী হইবে?” উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমার জন্য আমি ভাবি না।”

এদিকে নৌকা খানিক দূর গিয়া আটক পড়িল। বড়ো বড়ো শাল কাঠে খাল বদ্ধ! এমন সময়ে সহসা প্রহরীরা দূর হইতে দেখিল, নৌকা পলাইয়া যায়। পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল, একটাও গিয়া পৌঁছিল না। প্রহরীদের হাতে তলোয়ার ছিল, বন্দুক ছিল না। এক জন বন্দুক আনিতে গেল। খোঁজ খোঁজ করিয়া বন্দুক জুটিল তো চকমকি জুটিল না। “ওরে বারুদ কোথায়–গুলি কোথায়” করিতে করিতে রামমোহন ও অনুচরগণ কাঠের উপর দিয়া নৌকা টানিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। প্রহরীগণ অনুসরণ করিবার জন্য একটা নৌকা ডাকিতে গেল। যাহার উপরে নৌকা ডাকিবার ভার পড়িল পথের মধ্যে সে হরি মুদির দোকানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইল ও রামশংকরকে তাহার বিছানা হইতে উঠাইয়া তাহার পাওনা টাকা শীঘ্র পাইবার জন্য তাগাদা করিয়া গেল। যখন নৌকার প্রয়োজন একেবারে ফুরাইল তখন হাঁকডাক করিতে করিতে নৌকা আসিল। বিলম্ব দেখিয়া সকলে নৌকা-আহ্বানকারীকে সুদীর্ঘ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, “আমি তো আর ঘোড়া নই।” একে একে সকলের যখন ভর্ৎসনা করা ফুরাইল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল যে নৌকা ধরিবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই। নৌকা আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, ভর্ৎসনা করিতে তাহার তিন গুণ বিলম্ব হইল। যখন রামচন্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গিয়া পৌছিল তখন ফর্নান্ডিজ এক তোপের আওয়াজ করিল। প্রত্যুষে

প্রতাপাদিত্যের নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সেই তোপের শব্দে সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, "প্রহরী।" কেহই আসিল না। দ্বারের প্রহরীগণ সেই রাত্রেই পালাইয়া গেছে। প্রতাপাদিত্য উচ্চতর স্বরে ডাকিলেন, "প্রহরী।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "প্রহরী।" যখন প্রহরী আসিল না, তখন অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাকিলেন, "মন্ত্রী।" একজন ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে মন্ত্রীকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

"মন্ত্রী, প্রহরীরা কোথায় গেল?"

মন্ত্রী কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পলাইয়া গেছে।" মন্ত্রী দেখিলেন, মাথার উপরে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্ত প্রতাপাদিত্যের কথা স্পষ্ট পরিষ্কার দ্রুত উত্তর দিলেন। যতই ঘুরাইয়া ও যতই বিলম্ব করিয়া তাঁহার কথার উত্তর দেওয়া হয়, ততই তিনি আগুন হইয়া উঠিতে থাকেন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "অন্তঃপুরের প্রহরীরা?"

মন্ত্রী কহিলেন, "আসিবার সময় দেখিলাম তাহারা হাতপা-বাঁধা পড়িয়া আছে।"

মন্ত্রী রাত্রির ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। কী হইয়াছে কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন না। অথচ বুঝিয়াছেন, একটা কী ঘোরতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে-সময়ে মহারাজকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব।

প্রতাপাদিত্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য কোথায়? বসন্ত রায় কোথায়?"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "বোধ করি তাঁহারা অন্তঃপুরেই আছেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বোধ তো আমিও করিতে পারিতাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কী করিতে। যাহা বোধ করা যায় তাহা সকল সময়ে সত্য হয় না।"

মন্ত্রী কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রমাপতির কাছে রাত্রের ঘটনা সমস্তই অবগত হইলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র রায় পালাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইল। মন্ত্রী বাহিরে গিয়া দেখিলেন, খর্বকায় রমাই ভাঁড় গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। মন্ত্রীকে দেখিয়া রমাই ভাঁড় কহিল, "এই যে মন্ত্রী জাম্বুবান।" বলিয়া দাঁত বাহির করিল। তাহার সেই দন্তপ্রধান হাস্যকে রামচন্দ্রের সভাসদেরা রসিকতা বলিত, বিভীষিকা বলিত না। মন্ত্রী তাহার সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না। একজন ভৃত্যকে কহিলেন, "ইহাকে লইয়া আয়।" মন্ত্রী ভাবিলেন, এই অপদার্থটাকে এই বেলা প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের সামনে খাড়া করিয়া দিই। প্রতাপাদিত্যের বজ্র এক জন না এক জনের উপরে পড়িবেই– তা এই কলাগাছটার উপরেই পড়ুক, বাকি বড়ো বড়ো গাছ রক্ষা পাক্।

রমাইকে দেখিয়াই প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশেষত সে যখন প্রতাপাদিত্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দাঁত বাহির করিয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া একটা হাস্যরসের কথা কহিবার উপক্রম করিল, তখন প্রতাপাদিত্যের আর সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দুই হাত নাড়িয়া দারুণ ঘৃণায় বলিয়া উঠিলেন, "দূর করো, দূর করো, উহাকে এখনই দূর করিয়া দাও। ওটাকে আমার সম্মুখে আনিতে কে কহিল?" প্রতাপাদিত্যের রাগের সহিত যদি ঘৃণার উদয় না হইল, তবে রমাই ভাঁড় এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাইত না। কেননা ঘৃণ্য ব্যক্তিকে প্রহার করিতে গেলেও স্পর্শ করিতে হয়। রমাইকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, রাজজামাতা–"

প্রতাপাদিত্য অধীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র রায়–"

মন্ত্রী কহিলেন, "হাঁ, তিনি কাল রাত্রে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

প্রতাপাদিত্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! প্রহরীরা গেল কোথায়?"

মন্ত্রী পুনরায় কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালাইয়া গেছে।"

প্রতাপাদিত্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "পালাইয়া গেছে? পালাইবে কোথায়? যেখানে থাকে তাহাদের খুঁজিয়া আনিতে হইবে। অন্তঃপুরে প্রহরীদের এখনই ডাকিয়া লইয়া এস।" মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্র রায় যখন নৌকায় চড়িলেন তখনো অন্ধকার আছে। উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, সুরমা ও বিভা সে-রাত্রে আসিয়া আর বিছানায় শুইল না। বিভা একটি কথা না বলিয়া, একটি অশ্রু না ফেলিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া রহিল, সুরমা তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। উদয়াদিত্য ও বসন্ত রায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকার ঘরে পরস্পরের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যে যেন অদৃশ্য এক জন কে– অন্ধকার বল, আশঙ্কা বল, অদৃষ্ট বল– বসিয়া আছে, তাহার নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে। সদানন্দ-হৃদয় বসন্ত রায় চারিদিকে নিরানন্দ দেখিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অনবরত টাকে হাত বুলাইতেছেন, চারিদিক দেখিতেছেন, ও ভাবিতেছেন– এ কী হইল। তাঁহার গোলমাল ঠেকিয়াছে, চারিদিককার ব্যাপার ভালরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। সমস্ত ঘটনাটা তাঁহার একটা জটিল দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। এক-একবার বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কাতর স্বরে কহিতেছেন, "দাদা।" উদয়াদিত্য কহিতেছেন, "কী দাদামহাশয়?" তাহার উত্তরে বসন্ত রায়ের আর কথা নাই। ওই এক "দাদা" সম্বোধনের মধ্যে একটি আকুল দিশাহারা হৃদয়ের বাক্যহীন সহস্র অব্যক্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে। তাঁহার বিশেষ একটা কোনো প্রশ্ন নাই, তাঁহার সমস্ত কথার অর্থই– এ কী?

চারিদিককার অন্ধকার এমনি গোলমাল করিয়া একটা কী ভাষায় তাঁহার কানের কাছে কথা কহিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে উদয়াদিত্যের সাড়া পাইলেও তাঁহার মনটা একটু স্থির হয়। থাকিয়া থাকিয়া তিনি সকাতরে উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার জন্যই কি এ-সমস্ত হইল?" তাঁহার বার বার মনে হইতেছে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারাতেই এই সমস্ত ঘটিয়াছে। উদয়াদিত্যের তখন অধিক কথা কহিবার মতো ভাব নহে। তিনি কোমল স্বরে কহিলেন, "না দাদামহাশয়।" অনেকক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "বিভা, দিদি আমার, তুই কথা কহিতেছিস না কেন?" বলিয়া বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "সুরমা, ও সুরমা।" সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিল, আর কিছু বলিল না। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটা অনির্দেশ্য বিপদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সুরমা তখন স্থিরভাবে বসিয়া বিভার কপালে হাত বুলাইতেছিল, কিন্তু সুরমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই দেখিতেছিলেন। সুরমা সেই অন্ধকারে একবার উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিল। তখন উদয়াদিত্য দেয়ালে মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিলেন। সুরমার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগল। আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিল, পাছে বিভা জানিতে পায়।

যখন চারিদিক আলো হইয়া আসিল তখন বসন্ত রায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তখন তাঁহার মন হইতে একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কার ভাব দূর হইল। তখন স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলেন। তিনি বিভার ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। অন্তঃপুরের দ্বারে হাতপা-বাঁধা সীতারামের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে কহিলেন, "দেখ সীতারাম, তোকে যখন প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিবে, কে তোকে বাঁধিয়াছে,

তুই আমার নাম করিস। প্রতাপ জানে, এককালে বসন্ত রায় বলিষ্ঠ ছিল, সে তোর কথা বিশ্বাস করিবে।"

সীতারাম প্রতাপাদিত্যের কাছে কী জবাব দিবে, এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। এ সম্বন্ধে উদয়াদিত্যের নাম করিতে কোনোমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। সে একটা বাঁকা-পা তিন-চোখো তালবৃক্ষাকৃতি ভূতকে আসামী করিবে বলিয়া একবার স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বসন্ত রায়কে পাইয়া নিরপরাধ ভূতটাকে খালাস দিল। বসন্ত রায়ের কথায় সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া কহিলেন, "ভাগবত, প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়ো বসন্ত রায় তোমাকে বাঁধিয়াছে।" সহসা ভাগবতের ধর্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, অসত্যের প্রতি নিতান্ত বিরাগ জন্মিল; তাহার প্রধান কারণ, উদয়াদিত্যের প্রতি সে ভারি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবত কহিল, "এমন কথা আমাকে আদেশ করিবেন না, ইহাতে আমার অধর্ম হইবে।" বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিলেন, "ভাগবত, আমার কথা শুন; ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। সাধু লোকের প্রাণ বাঁচাইতে মিথ্যা কথা বলিতে যদি কোনো অধর্ম থাকিবে, তবে আমি কেন তোমাকে এমন অনুরোধ করিব?" বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া পিঠে হাত দিয়া বার বার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। কিন্তু লোকের যখন ধর্মজ্ঞান সহসা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তখন কোনো যুক্তিই তাহার কাছে খাটে না। সে কহিল, "না মহারাজ, মনিবের কাছে মিথ্যা কথা বলিব কী করিয়া।"

বসন্ত রায় বিষম অস্থির হইয়া উঠিলেন। ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "ভাগবত, আমার কথা শুন, আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলি, এ মিথ্যা কথায় কোনো পাপ নাই। দেখো বাপু, আমি তোমাকে পরে খুব খুশি করিব, তুমি আমার কথা রাখো। এই লও আমার কাছে যাহা আছে, এই দিলাম।"

ভাগবত তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইল ও সেই টাকাগুলা মুহূর্তের মধ্যে তাহার ট্যাঁকে আশ্রয় লাভ করিল। বসন্ত রায় কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রহরীদ্বয়ের ডাক পড়িয়াছে। মন্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া স্থির গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক কথা ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "কাল রাত্রে অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হইল কী করিয়া?"

সীতারামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।"

মহারাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "সে-কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "আজ্ঞা না, বলি মহারাজ, যুবরাজ– যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বাঁধিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছিলেন।" যুবরাজের নাম তাহার মুখ দিয়া কেমন হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। ওই নামটা কোনোমতে করিবে না বলিয়া সে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাবিয়াছিল, এই নিমিত্ত গোলমালে ওই নামটাই সর্বাগ্রে তাহার মুখাগ্রে উপস্থিত হইল। একবার যখন বাহির হইল তখন আর রক্ষা নাই।

এমন সময় বসন্ত রায় শুনিলেন, প্রহরীদের ডাক পড়িয়াছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সীতারাম কহিতেছে, "যুবরাজকে আমি নিষেধ করিলাম, তিনি শুনিলেন না।"

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ সীতারাম, কী কহিলি? অধর্ম করিস নে, সীতারাম, ভগবান তোর 'পরে সন্তুষ্ট হইবেন। উদয়াদিত্যের ইহাতে কোনো দোষ নাই।"

সীতারাম তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তবে তোর দোষ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা না।"

"তবে কার দোষ?"

"আজ্ঞা মহারাজ–"

ভাগবতকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন সে সমস্ত কথা ঠিক করিয়া কহিল, কেবল সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেইটে গোপন করিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় চারিদিক ভাবিয়া কোনো উপায় দেখিলেন না। তিনি চোখ বুজিয়া মনে মনে "দুর্গা" "দুর্গা" কহিলেন। প্রহরীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করা হইল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহাদের যদি বলপূর্বক বাঁধিতে পারা যায় তবে তাহারা প্রহরী-বৃত্তি করিতে আসিয়াছে কী বলিয়া? এই অপরাধের জন্য তাহাদের প্রতি কশাঘাতের আদেশ হইল।

তখন প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নাই!" এমনিভাবে বলিলেন যেন উদয়াদিত্যের সে অপরাধ বসন্ত রায়েরই। যেন তিনি উদয়াদিত্যকে সম্মুখে রাখিয়াই ভর্ৎসনা করিতেছেন। বসন্ত রায়ের অপরাধ, তিনি উদয়াদিত্যকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, "বাবা প্রতাপ, উদয়ের ইহাতে কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া কহিলেন, "দোষ নাই? তুমি দোষ নাই বলিতেছ বলিয়াই তাহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। তুমি মাঝে পড়িয়া মীমাংসা করিতে আসিয়াছ কেন?"

বসন্ত রায় অত করিয়া উদয়াদিত্যের পক্ষ লইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপাদিত্যের মন উদয়াদিত্যের বিশেষ বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। বসন্ত রায় দেখিলেন, তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই পাছে উদয়াদিত্যকে শাস্তি দেওয়া হয়। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “যদি জানিতাম উদয়াদিত্যের কিছুমাত্র নিজের মনের জোর আছে, তাহার একটা মত আছে, একটা অভিপ্রায় আছে, যাহা করে, সব নিজে হইতেই করে, যদি না জানিতাম যে সে-নির্বোধটাকে যে খুশি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া বেড়াইতে পারে, কটাক্ষের সংকেতে ঘুরাইয়া মারিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আজ রক্ষা ছিল না। আমি যেখানে ওই পালকটাকে উড়িতে দেখিয়াছি, নিচের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি ফুঁ দিতেছে কে। এইজন্য উদয়াদিত্যকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে না। সে শাস্তিরও অযোগ্য। কিন্তু শোনো, পিতৃব্যঠাকুর, তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোহরে আসিয়া উদয়াদিত্যের সহিত দেখা কর তবে তাহার প্রাণ বাঁচানো দায় হইবে।”

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন, “ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চলিলাম।” আর-একটি কথা না বলিয়া বসন্ত রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বাহির হইয়া গিয়া গভীর এক নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপাদিত্য স্থির করিয়াছেন, যে কেহ উদয়াদিত্যকে ভালোবাসে, উদয়াদিত্য যাহাদের বশীভূত, তাহাদিগকে উদয়াদিত্যের নিকট হইতে তফাত করিতে হইবে। মন্ত্রীকে কহিলেন, “বউমাকে আর রাজপুরীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কোনো সূত্রে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইতে হইবে।” বিভার প্রতি প্রতাপাদিত্যের কোনো আশঙ্কা হয় নাই; হাজার হউক, সে বাড়ির মেয়ে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের ঘরে আসিয়া কহিলেন, "দাদা, তোর সঙ্গে আর দেখা হইবে না।" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বৃদ্ধ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "কেন, দাদামহাশয়?"

বসন্ত রায় সমস্ত বলিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, "ভাই, তোকে আমি ভালোবাসি বলিয়াই তোর এত দুঃখ। তা তুই যদি সুখে থাকিস তো এ-কটা দিন আমি এক-রকম কাটাইয়া দিব।"

উদয়াদিত্য মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, তাহা কখনোই হইবে না। তোমাতে আমাতে দেখা হইবেই। তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। তুমি গেলে দাদামহাশয়, আমি বাঁচিব না।"

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "প্রতাপ আমাকে বধ করিল না, তোকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইল। দাদা, আমি যখন চলিয়া যাইব, আমার পানে ফিরিয়া চাহিস নে, মনে করিস বসন্ত রায় মরিয়া গেল।

উদয়াদিত্য শয়নকক্ষে সুরমার নিকটে গেলেন। বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বিভার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "বিভা, দিদি আমার, একবার ওঠ্। বুড়ার এই মাথাটায় একবার ওই হাত বুলাইয়া দে।" বিভা উঠিয়া বসিয়া দাদামহাশয়ের মাথা লইয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য সুরমাকে সমস্ত কহিলেন ও বলিলেন, “সুরমা, পৃথিবীতে আমার যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্য যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।” সুরমার হাত ধরিয়া কহিলেন, “সুরমা, তোমাকে যদি কেহ আমার কাছ হইতে ছিনিয়া লইয়া যায়?”

সুরমা দৃঢ়ভাবে উদয়াদিত্যকে আলিঙ্গন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, “সে যম পারে, আর কেহ পারে না।”

সুরমার মনেও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইরূপ একটা আশঙ্কা জন্মিতেছে। সে যেন দেখিতে পাইতেছে, একটা কঠোর হস্ত তাহার উদয়াদিত্যকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সে মনে মনে উদয়াদিত্যকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল, “আমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।’

সুরমা আবার কহিল, “আমি অনেকক্ষণ হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছি আমাকে তোমার কাছ হইতে কেহই লইতে পারিবে না।”

সুরমা ওই কথা বার বার করিয়া বলিল। সে মনের মধ্যে বল সঞ্চয় করিতে চায়, যে-বলে সে উদয়াদিত্যকে দুই বাহু দিয়া এমন জড়াইয়া থাকিবে যে, কোনো পার্থিব শক্তি তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বার বার ওই কথা বলিয়া মনকে সে বজ্রের বলে বাঁধিতেছে।

উদয়াদিত্য সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “সুরমা, দাদামহাশয়কে আর দেখিতে পাইব না।”

সুরমা নিশ্বাস ফেলিল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি নিজের কষ্টের জন্য ভাবি না সুরমা, কিন্তু দাদামহাশয়ের প্রাণে যে বড়ো বাজিবে। দেখি বিধাতা আরো কী করেন। তাঁর আরো কী ইচ্ছা আছে।”

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের কত গল্প করিলেন।

বসন্ত রায় কোথায় কী কহিয়াছিলেন, কোথায় কী করিয়াছিলেন সমুদায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বসন্ত রায়ের করুণ হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডারে ছোটো রত্নের মতো জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই আজ একে একে সুরমার কাছে বাহির করিতে লাগিলেন।

সুরমা কহিল, "আহা, দাদামহাশয়ের মতো কি আর লোক আছে।"

সুরমা ও উদয়াদিত্য বিভার ঘরে গেলেন।

তখন বিভা তাহার দাদামহাশয়ের পাকা চুল তুলিতেছে, ও তিনি বসিয়া গান গাহিতেছেন,

"ওরে, যেতে হবে, আর দেরি নাই,
পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই।
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,
(ওরে) পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই।
খেলতে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হতে আয় রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা,
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চল্ রে সোজা,
(সেথা) নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে ঠাঁই।"

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, "দেখো ভাই, বিভা আমাকে ছাড়িতে চায় না। কী জানি আমাকে উহার কিসের আবশ্যক। এক কালে যে দুধ ছিল, বুড়া হইয়া সে ঘোল হইয়া উঠিয়াছে,তা বিভা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে চায় কেন? আমি যাব শুনিয়া বিভা কাঁদে! এমন আর কখনো শুনিয়াছ? আমি ভাই, বিভার কান্না দেখিতে পারি না।" বলিয়া গাহিতে লাগিলেন,

"আমার যাবার সময় হল,

আমায় কেন রাখিস ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে
বাঁধিস নে আর মায়াডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকসি নে ভাই,
যেতে হবে ত্বরা করে।"

"ওই দেখো, ওই দেখো বিভার রকম দেখো। দেখ্ বিভা, তুই যদি অমন করিয়া কাঁদিবি তো–" বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের আর কথা বাহির হইল না। তিনি বিভাকে শাসন করিতে গিয়া নিজেকে আর সমালাইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া কহিলেন, "দাদা, ওই দেখো ভাই, সুরমা কাঁদিতেছে। এই বেলা ইহার প্রতিবিধান করো; নহিলে আমি সত্য সত্যই থাকিয়া যাইব, তোমার জায়গাটি দখল করিয়া বসিব। ওই দুই হাতে পাকা চুল তোলাইব, ওই কানের কাছে এই ভাঙা দাঁতের পাটির মধ্য হইতে ফিসফিস করিব, আর কানের অত কাছে গিয়া আর যদি কোনো প্রকার অঘটন সংঘটন হয় তবে তাহার দায়ী আমি হইব না।"

বসন্ত রায় দেখিলেন, কেহ কোনো কথা কহিল না, তখন তিনি কাতর হইয়া তাঁহার সেতারটা তুলিয়া লইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বিষম বেগে বাজাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু বিভার চোখের জল দেখিয়া তাঁহার সেতার বাজাইবার বড়োই ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তাঁহার চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিভাকে এবং উপস্থিত সকলকে তিরস্কারচ্ছলে রাশ রাশ কথা বলিবার বাসনা হইতে লাগিল, কিন্তু

আর কথা জোগাইল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেতার বন্ধ করিয়া নামাইয়া রাখিতে হইল। অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল।

উদয়াদিত্যকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া শেষ কথা এই বলিয়া গেলেন, "এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না। সুরমা ভাই সুখে থাকো। বিভা–" কথা শেষ হইল না, অশ্রু মুছিয়া পালকিতে উঠিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মঙ্গলার কুটির যশোহরের এক প্রান্তে ছিল। সেইখানে বসিয়া সে মালা জপ করিতেছিল। এমন সময়ে শাকসবজির চুবড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গ কহিল, "আজ হাটে আসিয়াছিলাম, অমনি ভাবিলাম, অনেকদিন মঙ্গলা দিদিকে দেখি নাই, তা একবার দেখিয়া আসি গে। আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।" বলিয়া চুবড়ি রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে সেইখানে বসিল। "তা দিদি, তুমি তো সব জানই, সেই মিনসে আমাকে বড়ো ভালোবাসিত, ভালো এখনো বাসে তবে আর-এক জন কার 'পরে তার মন গিয়াছে আমি টের পাইয়াছি– তা সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় এমন করিতে পার না?"

মঙ্গলার নিকট গোরু হারানো হইতে স্বামী হারানো পর্যন্ত সকল প্রকার দুর্ঘটনারই ঔষধ আছে, তা ছাড়া সে বশীকরণের এমন উপায় জানে যে, রাজবাটীর বড়ো বড়ো ভৃত্য মঙ্গলার কুটিরে কত গণ্ডা গণ্ডা গড়াগড়ি যায়। যে-মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হইলে মাতঙ্গিনী বাঁচে সে আর কেহে নহে স্বয়ং মঙ্গলা।

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "সে মাগীর মরিবার জন্য বড়ো তাড়াতাড়ি পড়ে নাই, যমের কাজ বাড়াইয়া তবে সে মরিবে।" মঙ্গলা হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "তোমার মতন রূপসীকে ফেলিয়া আর কোথাও মন যায় এমন অরসিক আছে নাকি? তা নাতিনী, তোমার ভাবনা নাই। তাহার মন তুমি ফিরিয়া পাইবে। তোমার চোখের মধ্যেই ঔষধ

আছে, একটু বেশি করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিয়ো, তাহাতেও যদি না হয় তবে এই শিকড়টি তাহাকে পানের সঙ্গে খাওয়াইয়ো।” বলিয়া এক শুকনো শিকড় আনিয়া দিল।

মঙ্গলা মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বলি রাজবাটীর খবর কী?”

মাতঙ্গিনী হাত উল্‌টাইয়া কহিল, “সে-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই?”

মঙ্গলা কহিল, “ঠিক কথা। ঠিক কথা।”

মঙ্গলার যে এ-বিষয়ে সহসা মতের এতটা ঐক্য হইয়া যাইবে, তাহা মাতঙ্গিনী আশা করে নাই। সে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে পড়িয়া কহিল, “তা, তোমাকে বলিতে দোষ নাই। তবে আজ আমার বড়ো সময় নাই, আর-একদিন সমস্ত বলিব।” বলিয়া বসিয়া রহিল।

মঙ্গলা কহিল, “তা বেশ, আর-একদিন শুনা যাইবে।”

মাতঙ্গিনী অধীর হইয়া পড়িল, কহিল, “তবে আমি যাই ভাই। দেরি করিলাম বলিয়া আবার কত বকুনি খাইতে হইবে। দেখো ভাই, সেদিন আমাদের ওখানে রাজার জামাই আসিয়াছিলেন, তা তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেই রাত্রেই কাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।”

মঙ্গলা কহিল, “সত্যি নাকি? বটে। কেন বলো দেখি? তাই বলি, মাতঙ্গ না হইলে আমাকে ভিতরকার খবর কেহ দিতে পারে না।”

মাতঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া কহিল, “আসল কথা কী জান? আমাদের যে বউ-ঠাকরুনটি আছেন, তিনি দুটি চক্ষে কাহারো ভালো দেখিতে পারেন না। তিনি কী মন্তর জানেন, সোয়ামিকে একেবারে ভেড়ার মতন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি– না ভাই, কাজ নাই, কে কোথা দিয়া শুনিবে আর বলিবে মাতঙ্গ রাজবাড়ির কথা বাহিরে বলিয়া বেড়ায়।”

মঙ্গলা আর কৌতূহল সামলাইতে পারিল না; যদিও সে জানিত, আর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে মাতঙ্গ আপনি সমস্ত বলিবে, তবু তাহার বিলম্ব সহিল না, কহিল,

"এখানে কোনো লোক নাই নাতনী। আর আপনা-আপনির মধ্যে কথা, ইহাতে আর দোষ কী? তা তোমাদের বউ-ঠাকরুন কী করিলেন?"

"তিনি আমাদের দিদি-ঠাকরুনের নামে জামাইয়ের কাছে কী সব লাগাইয়াছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদি-ঠাকরুনকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন। দিদি-ঠাকরুন তো কাঁদিয়া কাটিয়া অনাত্ত করিতেছেন। মহারাজা খাপা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বউ-ঠাকরুনকে শ্রীপুরে বাপের বাড়িতে পাঠাইতে চান। ওই দেখো ভাই, তোমার সকল কথাতেই হাসি। ইহাতে হাসিবার কী পাইলে? তোমার যে আর হাসি ধরে না।"

রামচন্দ্র রায়ের পলায়নবার্তার যথার্থ কারণ রাজবাটীর প্রত্যেক দাসদাসী সঠিক অবগত ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথার ঐক্য ছিল না।

মঙ্গলা কহিল, "তোমাদের মা-ঠাকরুনকে বলিয়ো যে, বউ-ঠাকরুনকে শীঘ্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।" বলিয়া সে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল। মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ কথা।"

মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বউ-ঠাকরুনকে কি যুবরাজ বড়ো ভালোবাসেন?"

"সে কথায় কাজ কী। এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। যুবরাজকে "তু' বলিয়া ডাকিলেই আসেন।"

"আচ্ছা আমি ওষুধ দিব। দিনের বেলাও কি যুবরাজ তাঁহার কাছেই থাকেন?"

"হাঁ।"

মঙ্গলা কহিল, "ও মা কী হইবে। তা সে যুবরাজকে কী বলে, কী করে, দেখিয়াছিস?"

"না ভাই, তাহা দেখি নাই।"

"আমাকে একবার রাজবাটীতে লইয়া যাইতে পারিস, আমি তাহা হইলে একবার দেখিয়া আসি।"

মাতঙ্গ কহিল, "কেন ভাই, তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

মঙ্গলা কহিল, "বলি তা নয়। একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিব, কী মন্ত্রে সে বশ করিয়াছে, আমার মন্ত্র খাটিবে কি না।"

মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ, আজ তবে আসি।" বলিয়া চুবড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মাতঙ্গ চলিয়া গেলে মঙ্গলা যেন ফুলিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চক্ষুতারকা প্রসারিত করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিভা প্রাসাদের ছাদের উপর গেল। ছাদের উপর হইতে দেখিল, পালকি চলিয়া গেল। বসন্ত রায় পালকির মধ্য হইতে মাথাটি বাহির করিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে চোখের জলের মধ্য হইতে পরিবর্তনহীন অবিচলিত পাষাণহৃদয় রাজবাটীর দীর্ঘ কঠোর দেয়ালগুলা ঝাপসা ঝাপসা দেখিতে পাইলেন। পালকি চলিয়া গেল, কিন্তু বিভা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের পানে চাহিয়া রহিল। তারাগুলি উঠিল, দীপগুলি জ্বলিল, পথে লোক রহিল না। বিভা দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরমা তাহাকে সারা দেশ খুঁজিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। বিভার গলা ধরিয়া স্নেহের স্বরে কহিল, “কী দেখিতেছিস বিভা?” বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “কে জানে ভাই।” বিভা সমস্তই শূন্যময় দেখিতেছে, তাহার প্রাণে সুখ নাই। সে কেন যে ঘরের মধ্যে যায়, কেন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, কেন শুইয়া পড়ে, কেন উঠিয়া যায়, কেন দুই প্রহর মধ্যাহ্নে বাড়ির এ-ঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না। রাজবাড়ি হইতে তাহার বাড়ি চলিয়া গেছে যেন, রাজবাড়িতে যেন তাহার ঘর নাই। অতি ছেলেবেলা হইতে নানা খেলাধুলা, নানা সুখদুঃখ হাসিকান্নায় মিলিয়া রাজবাটীর মধ্যে তাহার জন্য যে একটি সাধের ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিল, সে ঘরটি একদিনে কে ভাঙিয়া দিল রে। এ ঘর তো আর তাহার ঘর নয়। সে এখন গৃহের মধ্যে গৃহহীন। তাহার দাদামহাশয় ছিল, গেল; তাহার– চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভাকে লইতে কবে লোক আসিবে? হয়তো রামমোহন মাল রওনা হইয়াছে, এতক্ষণে তাহারা না জানি

কোথায়। বিভার সুখের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। তাহার অমন দাদা আছে, তাহার প্রাণের সুরমা আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও যেন একটা কী বিপদ ছায়ার মতো পশ্চাতে ফিরিতেছে। যে-বাড়ির ভিটা ভেদ করিয়া একটা ঘন ঘোর গুপ্ত রহস্য অদৃশ্যভাবে ধূমায়িত হইতেছে সে-বাড়িকে কি আর ঘর বলিয়া মনে হয়?

উদয়াদিত্য শুনিলেন, কর্মচ্যুত হইয়া সীতারামের দুর্দশা হইয়াছে। একে তাহার এক পয়সার সম্বল নাই, তাহার উপর তাহার অনেকগুলি গলগ্রহ জুটিয়াছে। কারণ যখন সে রাজবাড়ি হইতে মোটা মাহিয়ানা পাইত, তখন তাহার পিসা সহসা স্নেহের আধিক্যবশত রাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্নেহাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মিলনের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া কহিল যে, সীতারামকে দেখিয়াই তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত দূর হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হওয়ার বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু কেবল সীতারামকে দেখিয়াই হইত কিনা, সে-বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই। সীতারামের এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভগিনী তাহার এক পুত্রকে কাজকর্মে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে সহসা তাহার চৈতন্য হইল যে, বাছাকে ছোটো কাজে নিযুক্ত করিলে বাছার মামাকে অপমান করা হয়। এই বুঝিয়া সে বাছার মামার মান রক্ষা করিবার জন্য কোনোমতে সে-কাজ করিতে পারিল না। এইরূপে সে মান রক্ষা করিয়া সীতারামকে ঋণী করিল ও তাহার বিনিময়ে আপনার প্রাণরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার উপর সীতারামের বিধবা মাতা আছে ও এক অবিবাহিতা বালিকা কন্যা আছে। এদিকে আবার সীতারাম লোকটি অতিশয় শৌখিন, আমোদপ্রমোদটি নহিলে তাহার চলে না। সীতারামের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ তাহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন কিছুই হয় নাই। তাহার পিসার ক্ষুধাতৃষ্ণা ঠিক সমান রহিয়াছে; তাহার ভাগিনেয়টির যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই তাহার উদরের প্রসর ও মামার মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি

অধিক করিয়া বাড়িতেছে। সীতারামের টাকার থলি ব্যতীত আর কাহারও উদর কমিবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না। সীতারামের অন্যান্য গলগ্রহের সঙ্গে শখটিও বজায় আছে, সেটি ধারের উপর বর্ধিত হইতেছে, সুদও যে-পরিমাণে পুষ্ট হইতেছে, সেও সেই পরিমাণে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উদয়াদিত্য সীতারামের দারিদ্র৻দশা শুনিয়া তাহার ও ভাগবতের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। সীতারাম টাকাটা পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। মহারাজার নিকট উদয়াদিত্যের নাম করিয়া অবধি সে নিজের কাছে ও উদয়াদিত্যের কাছে নিতান্ত অপরাধী হইয়া আছে। উদয়াদিত্যের টাকা পাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। একদিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে ভগবান, জগদীশ্বর, দয়াময় সম্বোধন করিয়া বিস্তর ক্ষমা চাহিল। ভাগবত লোকটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির। সে শতরঞ্চ খেলে, তামাক খায় ও প্রতিবেশীদিগকে স্বর্গনরকের জমি বিলি করিয়া দেয়। সে যখন উদয়াদিত্যের টাকা পাইল, তখন মুখ বাঁকাইয়া নানা ভাবভঙ্গীতে জানাইল যে যুবরাজ তাহার যে সর্বনাশ করিয়াছেন এ টাকাতে তাহার কী প্রতিশোধ হইবে। টাকাটা লইতে সে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

যুবরাজ কর্মচ্যুত প্রহরীদ্বয়কে মাসিক বৃত্তি দিতেছেন, এ-কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। আগে হইলে যাইত না। আগে তিনি উদয়াদিত্যকে এত অবহেলা করিতেন যে, উদয়াদিত্য সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার কানে যাইত না। মহারাজ জানিতেন যে, উদয়াদিত্য প্রজাদের সহিত মিশিতেন, এবং অনেক সময়ে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রায় এমন সামান্য ও এমন অল্পে অল্পে তাহা তাঁহার সহিয়া আসিয়াছিল যে, বিশেষ একটা কিছু না হইলে উদয়াদিত্যের অস্তিত্ব তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না। এইবার উদয়াদিত্যের প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, তাই উপরি-উক্ত ঘটনাটি অবিলম্বে তাঁহার কানে

গেল। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া আনিলেন ও কহিলেন, "আমি যে সীতারামকে ও ভাগবতকে কর্মচ্যুত করিলাম, সে কি কেবল রাজকোষে তাহাদের বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ ছিল না বলিয়া? তবে যে তুমি নিজের হইতে তাহাদের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছ?"

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি দোষী। আপনি তাহাদের দণ্ড দিয়া আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমি আপনার সেই বিচার অনুসারে মাসে মাসে তাহাদের নিকট দণ্ড দিয়া থাকি।"

ইতিপূর্বে কখনোই প্রতাপাদিত্যকে উদয়াদিত্যের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে হয় নাই। উদয়াদিত্যের ধীর গম্ভীর বিনীত স্বর ও তাঁহার সুসংযত কথাগুলি প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত মন্দ লাগিল না। উদয়াদিত্যের কথায় কোনো উত্তর না দিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি উদয়, ভবিষ্যতে তাহাদের যেন আর অর্থসাহায্য না করা হয়।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হইল।" হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "কিন্তু এমন কী অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে এতবড়ো শাস্তি আমাকে বহন করিতে হইবে? আমি কী করিয়া দেখিব, আমার জন্য আট-নয়টি ক্ষুধিত মুখে অন্ন জুটিতেছে না, আট-নয়টি হতভাগা নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আমার পাতে অন্নের অভাব নাই? পিতা, আমার যাহা-কিছু সব আপনারই প্রসাদে। আপনি আমার পাতে আবশ্যকের অধিক অন্ন দিতেছেন, কিন্তু আপনি যদি আমার আহারের সময় আমার সম্মুখে আট-নয়টি ক্ষুধিত কাতরকে বসাইয়া রাখেন, অথচ তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে বাধা দেন, তবে সে অন্ন যে আমার বিষ।"

উত্তেজিত উদয়াদিত্যকে প্রতাপাদিত্য কথা কহিবার সময় কিছুমাত্র বাধা দিলেন না, সমস্ত কথা শেষ হইলে পরে আস্তে আস্তে কহিলেন, "তোমার যা বক্তব্য তাহা শুনিলাম, এক্ষণে

আমার যা বক্তব্য তাহা বলি। ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, আর কেহ যদি তাহাদের বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেয়, তবে সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য হইবে।” প্রতাপাদিত্যের মনে মনে বিশেষ একটু রোষের উদয় হইয়াছিল। সম্ভবত তিনি নিজেও তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই “আমি যেন ভারি একটা নিষ্ঠুরতা করিয়াছি, তাই দয়ার শরীর উদয়াদিত্য তাহার প্রতিবিধান করিতে আসিলেন। দেখি, তিনি দয়া করিয়া কী করিতে পারেন। আমি যেখানে নিষ্ঠুর সেখানে আর যে কেহ দয়ালু হইবে, এতবড়ো আস্পর্ধা কাহার প্রাণে সয়!’

উদয়াদিত্য সুরমার কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। সুরমা কহিল, “সেদিন সমস্ত দিন কিছু খাইতে পায় নাই, সন্ধ্যাবেলায় সীতারামের মা সীতারামের ছোটো মেয়েটিকে লইয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি সেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু দিই, তবে তাহার সমস্ত পরিবার খাইতে পায়। সীতারামের মেয়েটি দুধের মেয়ে, সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহার মুখপানে কি তাকানো যায়। ইহাদের কিছু কিছু না দিলে ইহারা যাইবে কোথায়?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বিশেষত রাজবাটী হইতে যখন তাহারা তাড়িত হইয়াছে, তখন পিতার ভয়ে অন্য কেহ তাহাদের কর্ম দিতে বা সাহায্য করিতে সাহস করিবে না, এ-সময়ে আমরাও যদি বিমুখ হই তাহা হইলে তাহাদের আর সংসারে কেহই থাকিবে না। সাহায্য আমি করিবই, তাহার জন্য ভাবিয়ো না সুরমা, কিন্তু অনর্থক পিতাকে অসন্তুষ্ট করা ভালো হয় না, যাহাতে এ-কাজটা সমাধা করা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে।”

সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, “তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, আমি সমস্ত করিব। আমার উপরে ভার দাও।” সুরমা নিজেকে দিয়া উদয়াদিত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। এই বৎসরটা উদয়াদিত্যের দুর্বৎসর পড়িয়াছে। অদৃষ্ট তাঁহাকে যে-কাজেই প্রবৃত্ত করাইতেছে, সবগুলিই তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে; অথচ সেগুলি এমন কাজ যে,

সুরমার মতো স্ত্রী প্রাণ ধরিয়া স্বামীকে সে-কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুরমা তেমন স্ত্রী নহে। স্বামী যখন ধর্মযুদ্ধে যান, তখন সুরমা নিজের হাতে তাঁহার বর্ম বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর ঘরে গিয়া সে কাঁদে। সুরমার প্রাণ প্রতি পদে ভয়ে আকুল হইয়াছে, অথচ উদয়াদিত্যকে সে প্রতি পদে ভরসা দিয়াছে। উদয়াদিত্য ঘোর বিপদের সময় সুরমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন সুরমার চোখে জল, কিন্তু সুরমার হাত কাঁপে নাই, সুরমার পদক্ষেপ অটল।

সুরমা তাঁহার এক বিশ্বস্তা দাসীর হাত দিয়া সীতারামের মায়ের কাছে ও ভাগবতের স্ত্রীর কাছে বৃত্তি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দাসী বিশ্বস্তা বটে, কিন্তু মঙ্গলার কাছে এ-কথা গোপন রাখিবার সে কোনো আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। এই নিমিত্ত মঙ্গলা ব্যতীত বাহিরের আর কেহ অবগত ছিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যখন গোপনে বৃত্তি পাঠানোর কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল, তখন তিনি কথা না কহিয়া অন্তঃপুরে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন, সুরমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। উদয়াদিত্য বক্ষে দৃঢ় বল বাঁধিলেন। বিভা কাঁদিয়া সুরমার গলা জড়াইয়া কহিল, "তুমি যদি যাও, তবে এ শ্মশানপুরীতে আমি কী করিব?" সুরমা বিভার চিবুক ধরিয়া, বিভার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল, "আমি কেন যাইব বিভা, আমার সর্বস্ব এখানে রহিয়াছে।" সুরমা যখন প্রতাপাদিত্যের আদেশ শুনিল, তখন কহিল, "আমি পিত্রালয়ে যাইবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। সেখানে হইতে আমাকে লইতে লোক আসে নাই, আমার স্বামীরও এ-বিষয়ে মত নাই। অতএব বিনা কারণে সহসা পিত্রালয়ে যাইবার আমি কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না।" শুনিয়া প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া গেলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, কোনো উপায় নাই। সুরমাকে কিছু বলপূর্বক বাড়ি হইতে বাহির করা যায় না, অন্তঃপুরে শারীরিক বল খাটে না। প্রতাপাদিত্য মেয়েদের বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন, বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে তিনি জানিতেন, কিন্তু এই অবলাদের সম্বন্ধে কিরূপ চাল চালিতে হয়, তাহা তাঁহার মাথায় আসিত না। তিনি বড়ো বড়ো কাছি টানিয়া ছিঁড়িতে পারেন কিন্তু তাহার মোটা মোটা অঙ্গুলি দিয়া ক্ষীণ সূত্রের সূক্ষ্ম গ্রন্থি মোচন করিতে পারেন না। এই মেয়েগুলা তাঁহার মতে নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও জানিবার অনুপযুক্ত সামগ্রী। ইহাদের সম্বন্ধে যখনই কোনো গোল বাধে, তিনি তাড়াতাড়ি মহিষীর প্রতি ভার দেন। ইহাদের বিষয়ে ভাবিতে বসিতে তাঁহার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই এবং যোগ্যতাও নাই। ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ। এবারেও প্রতাপাদিত্য মহিষীকে ডাকিয়া কহিলেন,

"সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠাও।" মহিষী কহিলেন, "তাহা হইলে বাবা উদয়ের কী হইবে?" প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "উদয় তো আর ছেলেমানুষ নয়, আমি রাজকার্যের অনুরোধে সুরমাকে রাজপুরী হইতে দূরে পাঠাইতে চাই, এই আমার আদেশ।"

মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।" উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করিয়াছে?"

মহিষী কহিলেন, "কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ, কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া মহারাজার রাজকার্যে যে কী সুযোগ হইবে, তা মহারাজাই জানেন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মা, আমাকে কষ্ট দিয়া আমাকে দুঃখী করিয়া রাজকার্যের কী উন্নতি হইল? যতদূর কষ্ট সহিবার তাহা তো সহিয়াছি, কোন্ সুখ আমার অবশিষ্ট আছে? সুরমা যে বড়ো সুখে আছে তাহা নয়। দুই সন্ধ্যা সে ভর্ৎসনা সহিয়াছে, "দূর ছাই' সে অঙ্গ-আভরণ করিয়াছে, অবশেষে কি রাজবাড়িতে তাহার জন্য একটুকু স্থানও কুলাইল না! তোমাদের সঙ্গে কি তাহার কোনো সম্পর্ক নাই মা? সে কি ভিখারি অতিথি যে, যখন খুশি রাখিবে, যখন খুশি তাড়াইবে? তাহা হইলে মা, আমার জন্যও রাজবাড়িতে স্থান নাই, আমাকেও বিদায় করিয়া দাও।"

মহিষী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, "কী জানি বাবা। মহারাজা কখন কী যে করেন, কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি এখানে আর শান্তি নাই। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেল। তা ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক না কেন, দেখা যাক। কী বল বাছা! ও দিনকতক এখান হইতে গেলেই দেখিতে পাইবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।"

উদয়াদিত্য এ-কথার আর কোনো উত্তর করিলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

মহিষী কাঁদিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া পড়িলেন, "মহারাজ রক্ষা করো। সুরমাকে পাঠাইলে উদয় বাঁচিবে না। বাছার কোনো দোষ নাই, ওই সুরমা ওই ডাইনীটা তাহাকে কী মন্ত্র করিয়াছে।" বলিয়া মহিষী কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

প্রতাপাদিত্য বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সুরমা যদি না যায় তো আমি উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।"

মহিষী মহারাজার কাছ হইতে আসিয়া সুরমার কাছে গিয়া কহিলেন, "পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করিলি? আমার বাছাকে আমাকে ফিরাইয়া দে। আসিয়া অবধি তুই আমার কী সর্বনাশ না করিলি? অবশেষে– সে রাজার ছেলে তার হাতে বেড়ি না দিয়া কি তুই ক্ষান্ত হইবি না?"

সুরমা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "আমার জন্য তাঁর হাতে বেড়ি পড়িবে? সে কী কথা মা। আমি এখনই চলিলাম।"

সুরমা বিভার কাছে গিয়া সমস্ত কহিল। বিভার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা এই যে চলিলাম, আর বোধ করি আমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবে না।" বিভা কাঁদিয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সুরমা সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত প্রান্ত হইতে একটা কথা আসিয়া তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল, "আর হইবে না।" আর আসিতে পাইব না, আর কিছু রহিবে না! এমন একটা মহাশূন্য ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইল,– যে ভবিষ্যতে সে মুখ নাই, সে হাসি নাই, সে আদর নাই, চোখে চোখে বুকে বুকে প্রাণে প্রাণে মিলন নাই, সুখদুঃখের বিনিময় নাই, বুক ফাটিয়া গেলেও একমুহূর্তের জন্যও একবিন্দু প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছু নাই, কী ভয়ানক ভবিষ্যৎ।

সুরমার বুক ফাটিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল। উদয়াদিত্য আসিবামাত্র সুরমা তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া বুকে চাপিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা এমন করিয়া কখনো কাঁদে নাই। তাহার বলিষ্ঠ হৃদয় আজ শতধা হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে সুরমা?” সুরমা উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আর কি কথা কহিতে পারে? মুখের দিকে চায় আর কাঁদিয়া ওঠে। বলিল, “ওই মুখ আমি দেখিতে পাইব না? সন্ধ্যা হইবে, তুমি বাতায়নে আসিয়া বসিবে, আমি পাশে নাই? ঘরে দীপ জ্বালাইয়া দিবে, তুমি ওই দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে, আর আমি হাসিতে হাসিতে তোমার হাত ধরিয়া আনিব না? তুমি যখন এখানে, আমি তখন কোথায়?” সুরমা যে বলিল “কোথায়”, তাহাতে কতখানি নিরাশা, তাহাতে কত দূর-দূরান্তরের বিচ্ছেদের ভাব! যখন কেবলমাত্র চোখে চোখেই মিলন হইতে পারে তখন মধ্যে কত দূর! যখন তাহাও হইতে পারে না, তখন আরও কত দূর! যখন বার্তা লইতে বিলম্ব হয়, তখন আরও কত দূর! যখন প্রাণান্তিক ইচ্ছা হইলেও একমুহূর্তের জন্যও দেখা হইবে না, তখন–তখন ওই পা দুখানি ধরিয়া এমনি করিয়া বুকে চাপিয়া এই মুহূর্তেই মরিয়া যাওয়াতেই সুখ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপাখ্যানের আরম্ভভাগে রুক্মিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি পাঠকেরা তাহাকে বিস্মৃত হন নাই। এই মঙ্গলাই সেই রুক্মিণী। সে রায়গড় পরিত্যাগ করিয়া নাম-পরিবর্তন-পূর্বক যশোহরের প্রান্তদেশে বাস করিতেছে। রুক্মিণীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের ন্যায় সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্য-অধিকারলোলুপ। হাসিকান্না তাহার হাতধরা, আবশ্যক হইলে বাহির করে, আবশ্যক হইলে তুলিয়া রাখে। যখন সে রাগে তখন সে অতি প্রচণ্ডা, মনে হয় যেন রাগের পাত্রকে দাঁতে নখে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তখন অধিক কথা কয় না, চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকে, থরথর করিয়া কাঁপে, গলিত লৌহের মতো তাহার হৃদয়ের কটাহে রাগ টগবগ করিতে থাকে। তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ আছড়াইতে থাকে। এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে। যে শ্রেণীর লোকদের সহিত সে মেশে, তাহাদের মন সে আশ্চর্যরূপে বুঝিতে পারে। যুবরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন তখন সে যুবরাজের হৃদয়ের উপর সিংহাসন পাতিয়া তাঁহার হৃদয়রাজ্য ও যশোহর-রাজ্য একত্রে শাসন করিবে, এ আশা শয়নে স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। ইহার জন্য সে কী না করিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া রাজবাটীর সমস্ত দাসদাসীর সহিত সে ভাব করিয়া লইয়াছে। রাজবাটীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র খবরটি পর্যন্ত সে রাখে। সুরমার মুখ কবে মলিন হইল তাহাও সে শুনিতে পায়, প্রতাপাদিত্যের সামান্য পীড়া হইলেও তাহার কানে যায়, ভাবে এইবার বুঝি আপদটার মরণ হইবে। প্রতাপাদিত্য ও সুরমার মরণোদ্দেশে সে নানা

অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখনও তো কিছুই সফল হয় নাই। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সে মনে করে আজ হয়তো শুনিতে পাইব, প্রতাপাদিত্য অথবা সুরমা বিছানায় পড়িয়া মরিয়া আছে। প্রতিদিন তাহার অধীরতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ভাবিতেছে মন্ত্রতন্ত্র চুলায় যাক, একবার হাতের কাছে পাই তো মনের সাধ মিটাই। ভাবিতে ভাবিতে এমন অধর দংশন করিতে থাকে যে, অধর কাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হয়।

রুক্মিণী দেখিল যে, প্রতিদিন সুরমার প্রতি রাজার ও রাজমহিষীর বিরাগ বাড়িতেছে। অবশেষে এতদূর পর্যন্ত হইল যে, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। যখন সে দেখিল তবুও সুরমা গেল না, তখন সে বিদায় করিয়া দিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিল।

রাজমহিষী যখন শুনিলেন, মঙ্গলা- নামক একজন বিধবা তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ নানাপ্রকার জানে, তখন তিনি ভাবিলেন, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিবার আগে যুবরাজের মনটা তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লওয়া ভালো। মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনাইতে পাঠাইলেন।

মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া ভিজাইয়া বাঁটিয়া মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে নির্জন নগরপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটির-মধ্যে হামানদিস্তার শব্দ উঠিতে লাগিল, সেই শব্দই তাহার একমাত্র সঙ্গী হইল, সেই অবিশ্রাম একঘেয়ে শব্দ তাহার নর্তনশীল উৎসাহের তালে তালে করতালি দিতে লাগিল, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ নাচিতে লাগিল, তাহার চোখে আর ঘুম রহিল না।

ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিল। বিষ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু সুরমা মরিবার সময় যাহাতে যুবরাজের মনে দয়া না হয়, এই উদ্দেশে মন্ত্র পড়িতে ও অনুষ্ঠান করিতে অনেক সময় লাগিল।

প্রতাপাদিত্যের মত লইয়া মহিষী সুরমাকে আরও কিছুদিন রাজবাটীতে থাকিতে দিলেন। সুরমা চলিয়া যাইবে, বিভা চারিদিকে অকূল পাথার দেখিতেছে। এ কয়দিন সে অনবরত সুরমার কাছে বসিয়া আছে। একটি মলিন ছায়ার মতো যে চুপ করিয়া সুরমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এক-একটা দিন যায়, সন্ধ্যা আইসে, বিভা ততই যেন ঘনিষ্ঠতর ভাবে সুরমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। দিনগুলিকে কে যেন তাহার প্রাণপণ আকর্ষণ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। বিভার চারিদিকে অন্ধকার। সুরমার চক্ষেও সমস্তই শূন্য। তাহার আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নাই, সংসারের দিগ্‌বিদিক সমস্ত মিশাইয়া গেছে। সে উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকে, কোলের উপর শুইয়া থাকে, তাহার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, আর কিছু করে না। বিভাকে বলে, "বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলাম", বলিয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে; কাল প্রত্যুষে সুরমার বিদায়ের দিন। তাহার গার্হস্থ্যের যাহা-কিছু সমস্ত একে একে বিভার হাতে সমর্পণ করিল। উদয়াদিত্য প্রশান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, হয় সুরমাকে রাজপুরীতে রাখিবেন, নয় তিনিও চলিয়া যাইবেন। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সুরমা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয়নগৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল, কহিল, "বিভা, বিভা, শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক্ আর বিলম্ব নাই!"

উদয়াদিত্য দ্বারের কাছে আসিতেই সুরমা বলিয়া উঠিল, "এস, এস, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।" বলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া দিল। উদয়াদিত্য কাছে আসিতেই তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল। উদয়াদিত্য বসিলেন, তখন সুরমা বহু কষ্টে নিশ্বাস লইতেছে, তাহার হাত পা শীতল হইয়া আসিয়াছে। উদয়াদিত্য ভীত হইয়া ডাকিলেন, "সুরমা।" সুরমা অতি ধীরে মাথা তুলিয়া উদয়াদিত্যের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কী নাথ।" উদয়াদিত্য ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "কী হইয়াছে সুরমা?" সুরমা কহিল, "বোধ করি আমার সময় হইয়া আসিয়াছে।" বলিয়া উদয়াদিত্যের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত উঠাইতে চাহিল হাত উঠিল না। কেবল মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। উদয়াদিত্য দুই হাতে সুরমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "সুরমা, সুরমা, তুমি কোথায় যাইবে সুরমা। আমার আর কে রহিল?" সুরমার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কেবল বিভার মুখের দিকে চাহিল। বিভা তখন হতচেতন হইয়া বোধশূন্য নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া আছে। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সুরমা ও উদয়াদিত্য বসিয়া থাকিতেন, সম্মুখে সে বাতায়ন উন্মুক্ত। আকাশের তারা দেখা যাইতেছে, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, চারিদিক স্তব্ধ। ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া গেল, রাজবাটীতে পূজার শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়া ক্রমে থামিয়া গেল। সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "একটা কথা কও, আমি চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছি না।"

ক্রমে রাজবাটীতে রাষ্ট্র হইল যে, সুরমা নিজ হস্তে বিষ খাইয়া মরিতেছে। রাজমহিষী ছুটিয়া আসিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিল। সুরমার মুখ দেখিয়া মহিষী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সুরমা মা আমার, তুই এইখানেই থাক্, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কে যাইতে বলে?" সুরমা শাশুড়ীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিয়া কহিলেন, "মা তুই কি রাগ করিয়া গেলি

রে?" তখন সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কী কথা বলিতে গেল, বাহির হইল না। রাত্রি যখন চারি দণ্ড আছে, তখন চিকিৎসক কহিলেন "শেষ হইয়া গেছে!" "দাদা, কী হইল গো" বলিয়া বিভা সুরমার বুকের উপরে পড়িয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভাত হইয়া গেল, উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা কি আর নাই? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ওইদিকে কোথায় আছে! বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চুল বাঁধিবার সময় সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন এখনই সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি হইয়া আসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না। চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে, আজ বিভা এত কাঁদিতেছে, তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা তো কখনো এমন করে না। বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। আর আজ– ওরে, আজ বুক ফাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

উদয়াদিত্যের অর্ধেক বল অর্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল– সে-ই চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শয়নগৃহে যাইতেন, যেন কী ভাবিতেন, একবার চারিদিকে দেখিতেন, দেখিতেন– কেহ নাই। ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন; যেখানে সুরমা বসিত সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন– আকাশে সেই জ্যোৎস্না, সম্মুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে– মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে?

সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মতো কার গলার স্বর শুনিতে পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু একবার চারিদিকে দেখিতেন, একবার বিছানায়

যাইতেন, দেখিতেন– কেহ আছে কি না। যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের খেতের ও বাগানের ফলমূল শাকসবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন; আজকাল আর সে-সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া পড়েন শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে যে, সহসা শয়নকক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব– সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী ম্লানমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কত কী স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। একদিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিভা, এ-বাড়িতে আর তোর কে রহিল? তোকে এখন শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কী বলিস? আমার কাছে লজ্জা করিস না বিভা। তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল্?" বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ-কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেইখানে– সেই চন্দ্রদ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না তো কী? কিন্তু তাহাকে লইতে এ-পর্যন্ত একটিও তো লোক আসিল না! কেন আসিল না?

বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার প্রস্তাব উদয়াদিত্য একবার পিতার নিকট উত্থাপন করিলেন। প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি বিভার কোনো আদর থাকিত, তবে তাহারা বিভাকে লইতে নিজে হইতে লোক পাঠাইত। আমাদের অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক দেখি না।"

রাজমহিষী বিভাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করেন। বিভার সধবা অবস্থায় বৈধব্য কি চোখে দেখা যায়? বিভার করুণ মুখখানি দেখিলে তাঁহার প্রাণে শেল বাজে। তাহা ছাড়া মহিষী তাঁহার জামাতাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সে একটা কী ছেলেমানুষি করিয়াছে বলিয়া তাহার ফল যে এতদূর পর্যন্ত হইবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগে নাই। তিনি মহারাজের কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও।" মহারাজ রাগ করিলেন, কহিলেন "ওই এক কথা আমি অনেকবার শুনিয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। যখন তাহারা বিভাকে ভিক্ষা চাহিবে, তখন তাহারা বিভাকে পাইবে।" মহিষী কহিলেন, "মেয়ে অধিক দিন শ্বশুরবাড়ি না গেল দশজনে কী বলবে?" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আর প্রতাপাদিত্য নিজে সাধিয়া যদি মেয়েকে পাঠায় আর রামচন্দ্র রায় যদি তাহাকে দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলেই বা দশজনে কী বলিবে?"

মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিলেন, মহারাজা এক-এক সময় কী যে করেন তাহার কোনো ঠিকানা থাকে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মান অপমানের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ণ দৃষ্টি। রাজা একদিন চতুর্দোলায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, দুই জন অনভিজ্ঞ তাঁতি তাহাদের কুটিরের সম্মুখে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, চতুর্দোল দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই, রাজা তাহা লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার যশোহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ির এক চাকরকে তিনি একটা কী কাজের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, সে বেচারা এক শুনিতে আর শুনিয়াছিল, কাজে ভুল করিয়াছিল, মহামানী রামচন্দ্র রায় তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শ্বশুরবাড়ির ভৃত্যেরা তাঁহাকে মানে না। তাহারা অবশ্য তাহাদের মনিবদের কাছেই এইরূপ শিখিয়াছে নহিলে তাহারা সাহস করিত না। বিশেষত সেইদিন প্রাতঃকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যুবরাজ উদয়াদিত্য সেই চাকরকে চুপি চুপি কী একটা কথা বলিয়াছিলেন– অবশ্য তাঁহাকে অপমান করিবার পরামর্শই চলিতেছিল, নহিলে আর কী হইতে পারে। একদিন কয়েক জন বালক মাটির ঢিপির সিংহাসন গড়িয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ সাজিয়া রাজসভার অনুকরণে খেলা করিতেছিল। রাজার কানে যায়, তিনি তাহাদের পিতাদের ডাকিয়া বিলক্ষণ শাসন করিয়া দেন।

আজ মহারাজা গদির উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। সম্মুখে এক ভীরু দরিদ্র অপরাধী খাড়া রহিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। সে ব্যক্তি কোনো সূত্রে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায় সংক্রান্ত ঘটনা শুনিতে পায় ও তাহা লইয়া আপনা-আপনির মধ্যে আলোচনা করে, তাহাই শুনিয়া তাহার শত্রুপক্ষের একজন সে-কথাটা রাজার কানে

উত্থাপন করে। রাজা মহা খাপা হইয়া তাহাকে তলব করেন। তাহাকে ফাঁসিই দেন, কি নির্বাসনই দেন, এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেছে।

রাজা বলিতেছেন, "বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা!"

সে কাঁদিয়া কহিতেছে, "দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নাই।"

মন্ত্রী কহিতেছেন, "বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আমাদের মহারাজের তুলনা।"

দেওয়ান কহিতেছেন, "বেটা, জানিস না, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয়, তাহাকে রাজটিকা পরাইবার জন্য সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁহার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়া তাঁহাকে টিকা পরাইয়া দেন।"

রমাই ভাঁড় কহিতেছে, "বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য, উহারা তো দুই পুরুষে রাজা! প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খাইয়া খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাথাটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মতো চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমরা বেদে, আমরা জাত-সাপ চিনি না?" রাজা রামচন্দ্র রায় বিষম সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। আজকাল প্রত্যহ সভায় প্রতাপাদিত্যের উপর একবার করিয়া আক্রমণ হয়। প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠ লক্ষ্যপূর্বক শব্দভেদী বচন-বাণ বর্ষণ করিয়া সেনানীদের তূণ নিঃশর হইলে সভা ভঙ্গ হয়। যাহা হউক আজিকার বিচারে অপরাধী অনেক কাঁদাকাটি করাতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রামচন্দ্র রায় কহিলেন, "আচ্ছা যা, এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।"

অন্যান্য সভাসদ চলিয়া গেল, কেবল মন্ত্রী ও রমাই ভাঁড় রাজার কাছে রহিল। প্রতাপাদিত্যের কথাই চলিতে লাগিল।

রমাই কহিল, "আপনি তো চলিয়া আসিলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়িলেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হইলে হাতের লোহা ও বালা দুগাছি বিক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা লইয়া তম্বি কত!"

রাজা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, "বটে!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, শুনিতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হইতেছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার আহারনিদ্রা নাই।"

রাজা কহিলেন, "সত্য নাকি।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তামাক টানিতে লাগিলেন, বড়োই আনন্দ বোধ হইল।

মন্ত্রী কহিল, "আমি বলিলাম, আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনও তোমরা কর নাই। কেমন হে ঠাকুর!"

রমাই কহিল, "তাহার সন্দেহ আছে! মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়াছেন, সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় পা ধুইয়া আসিবেন না তো কী!"

এইরূপে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের কাল্পনিক মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করা হইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের যে কী অপরাধ

তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিজে বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র রায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন, সে-সকল কথা চুলায় গেল, আর তিনি প্রতাপাদিত্যের সন্তান হইয়াছেন, এই অপরাধে রামচন্দ্র রায় তাঁহার কথা তুলিয়া অকাতরে হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি এক জন লঘুহৃদয়, সংকীর্ণপ্রাণ লোক। উদয়াদিত্য যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ নহেন। তিনি মনে করেন, ইহা তো হইবেই, ইহা না হওয়াই অন্যায়। রামচন্দ্র রায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বাঁচাইবে না তো কী! তাঁহার মনে হয়, রামচন্দ্র রায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রাণে বেদনা লাগে। তিনি মনে করিতে পারেন না যে, পৃথিবীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম লোকেরও নিজের বিপদের কাছে মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় কিছুই নহে। দিবারাত্রি শত শত স্তুতিবাদকের দাঁড়িপাল্লায় এক দিকে জগৎকে ও আর-এক দিকে নিজেকে চড়াইয়া তিনি নিজেকেই ওজনে ভারি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এইজন্য সহজে আর কাহারও উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। তাহা ছাড়া উদয়াদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় না হইবার আর-এক কারণ এই যে, তিনি মনে করেন, উদয়াদিত্য নিজের ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণরক্ষাই উদয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা ছাড়া, যদি বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইত, তবুও তিনি উদয়াদিত্যকে লইয়া হাস্যপরিহাসের ত্রুটি করিতেন না। কারণ যেখানে দশজনে মিলিয়া একজনকে লইয়া হাসিতামাশা করিতেছে, বিশেষত রমাই ভাঁড় যাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে, সেখানে তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করেন বা তাহাদের সহিত যোগ না দেন, এমন তাঁহার মনের জোর নাই। তাঁহার মনে হয়, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে।

এখনও বিভার প্রতি রামচন্দ্র রায়ের আসক্তির মতো একটা ভাব আছে। বিভা সুন্দরী, বিভা সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিভার অতি অল্প দিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন– কিন্তু যখন সেই রাত্রে প্রথম নিদ্রা ভাঙিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্ধ-অনাবৃত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে, তাহার ক্ষুদ্র দুটি অধর কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিতেছে, তখন তাঁহার মনে সহসা একটা কী উচ্ছ্বাস হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার করুণ অধর চুম্বন করিবার জন্য একটা আবেগ উপস্থিত হইল, তখনই প্রথম তাঁহার শরীরে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখনই প্রথম তিনি বিভার নববিকশিত যৌবনের লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রথম তাঁহার নিশ্বাস বেগে বহিল, অর্ধনিমীলত নেত্রপল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুম্বন করিতে গেলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল, এমন সময়ে বিপদের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। সেই যে হৃদয়ের প্রথম বিকাশ, সেই যে বাসনার প্রথম উচ্ছ্বাস, সেই যে নয়নের মোহদৃষ্টি, তাহা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া তাহারা তৃষা-কাতর হইয়া রামচন্দ্র রায়ের স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিল। ইহা স্থায়ী প্রেমের ভাব নহে, কারণ রামচন্দ্র রায়ের লঘু হৃদয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। একটা বিলাসদ্রব্যের প্রতি শৌখিন হৃদয়ের যেমন সহসা একটা টান পড়ে, শৌখিন রামচন্দ্র রায়েরও বিভার প্রতি সেইরূপ একটা ভাব জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, যে-কারণেই হউক রামচন্দ্র রায়ের যৌবন-স্বপ্নে বিভা জাগিতেছিল। বিভাকে পাইবার জন্য তাঁহার একটা অভিলাষ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যদি বিভাকে আনিতে পাঠান, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে! সভাসদেরা যে তাঁহাকে স্ত্রৈণ মনে করিবে, মন্ত্রী যে মনে মনে অসন্তুষ্ট

হইবে, রমাই ভাঁড় যে মনে মনে হাসিবে! তাহা ছাড়া, প্রতাপাদিত্যের তাহা হইলে কী শাস্তি হইল? শ্বশুরের উপর প্রতিহিংসা তোলা হইল কই? এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিভাকে আনিতে পাঠাইতে তাঁহার ভরসা হয় না, প্রবৃত্তি হয় না। এমন কি, বিভাকে লইয়া হাস্যপরিহাস চলিতে থাকে, তাহাকে বাধা দিতেও তাঁহার সাহস হয় না, এবং প্রতাপাদিত্যের কথা মনে করিয়া তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছাও হয় না।

রমাই ভাঁড় ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে রামমোহন মাল আসিয়া জোড়হাতে কহিল, “মহারাজ।”

রাজা কহিলেন, “কী রামমোহন।”

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি ঠাকুরানীকে আনিতে যাই।

রাজা কহিলেন, “সে কী কথা!”

রামমোহন কহিল, “আজ্ঞা হাঁ। অন্তঃপুর শূন্য হইয়া আছে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না। অন্তঃপুরে যাই, মহারাজের ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার যেন প্রাণ কেমন করিতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করুন আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।”

রাজা কহিলেন, “রামমোহন তুমি পাগল হইয়াছ? সে-মেয়েকে আমি ঘরে আনি?”

রামমোহন নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, “কেন মহারাজ, আমার মা-ঠাকুরানী কী অপরাধ করিয়াছেন?”

রাজা কহিলেন, “বল কী রামমোহন। প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনিব?”

রামমোহন কহিল, “কেন আনিবেন না? প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিসের? যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন মেয়ে বাপের; বিবাহ হইলে পর আর তাহাতে বাপের অধিকার থাকে না। এখন আপনার মহিষী আপনার– আপনি যদি তাঁহাকে ঘরে না আনেন, আপনি যদি তাঁহাকে সমাদর না করেন, তবে আর কে করিবে?”

রাজা কহিলেন, "প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মান রক্ষা হইবে কী করিয়া?"

রামমোহন কহিল, "মান রক্ষা? আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোনো অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্য লোক যাহা ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মান রক্ষা হইতেছে?"

রাজা কহিলেন, "যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?"

রামমোহন বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া কহিল, "কী বলিলেন মহারাজ? যদি না দেয়? এতবড়ো সাধ্য কাহার যে দিবে না? আমার মা-জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কাহার সাধ্য তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে রাখিতে পারে? যতবড়ো প্রতাপাদিত্য হউন না কেন, তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইব। এই বলিয়া গেলাম। আমার মাকে আমি আনিব, তুমি বারণ করিবার কে?" বলিয়া রামমোহন প্রস্থানের উপক্রম করিল।

রাজা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু– দেখো, এ-কথা যেন কেহ শুনিতে না পায়। রমাই কিংবা মন্ত্রীর কানে যেন এ-কথা না উঠে।"

রামমোহন কহিল, "যে আজ্ঞা মহারাজ।" বলিয়া চলিয়া গেল।

যদিও মহিষী রাজপুরে আসিলেই সকলে জানিতে পারিবে, তথাপি সে অনেক বিলম্ব আছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আছে। আপাতত উপস্থিত লজ্জার হাত এড়াইতে পারিলেই রামচন্দ্র রায় বাঁচেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য কিসে সুখে থাকেন, দিনরাত বিভার সেই একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে সে তাঁহার সমস্ত কাজ করে। সে নিজে তাঁহার খাবার আনিয়া দেয়, আহারের সময় সম্মুখে বসিয়া থাকে, সামান্য বিষয়েও ত্রুটি হইতে দেয় না। যখন সন্ধ্যার সময় উদয়াদিত্য তাঁহার ঘরে আসিয়া বসেন, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বুঝি চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, তখন বিভা আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসে– কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে, কিছুই কথা জোগায় না। দুইজনে স্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। মলিন দীপের আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে দেয়ালের উপরে একটা আঁধারের ছায়া কাঁপিতেছে, বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বুক ফাটিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে, "দাদা, সে কোথায় গেল?" উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠেন, চক্ষুর আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, যেন বিভা কী বলিল ভালো বুঝিতে পারেন নাই, যেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, সহসা চৈতন্য হয়, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বিভার কাছে আসিয়া বলেন, "আয় বিভা একটা গল্প বলি শোন্।"

বর্ষার দিন খুব মেঘ করিয়াছে, সমস্ত দিন ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধার করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক-এক বার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। উদয়াদিত্য চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগন্তে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ কেবল যেন বলিতেছে, "সুরমা নাই–সে নাই।" মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস হুহু করিয়া

আসিয়া যেন বলিয়া যায়, “সুরমা কোথায়!” বিভা ধীরে ধীরে উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহে, “দাদা।” দাদা আর উত্তর দিতে পারেন না, বিভাকে দেখিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া বাতায়নের উপরে মাথা রাখিয়া পড়েন, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, রাত্রি হইতে থাকে। বিভা উদয়াদিত্যের আহারের আয়োজন করিয়া আবার আসিয়া বলে, “দাদা, খাবার আসিয়াছে, খাও’সে।” উদয়াদিত্য কোনো উত্তর করেন না। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। বিভা কাঁদিয়া কহে, “দাদা উঠ, রাত হইল।” উদয়াদিত্য মুখ তুলিয়া দেখেন, বিভা কাঁদিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিভার চোখ মুছাইয়া খাইতে যান। ভালো করিয়া খান না। বিভা তাই দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যায়, সে আর আহার স্পর্শ করে না।

বিভা কথা কহিতে, গল্প করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিভা অধিক কথা কহিতে পারে না। উদয়াদিত্যকে কী করিয়া যে সুখে রাখিবে ভাবিয়া পায় না। সে কেবল ভাবে, আহা যদি দাদামহাশয় থাকিতেন!

আজকাল উদয়াদিত্যের মনে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করেন। আর সে পূর্বেকার সাহস নাই। বিপদকে তৃণজ্ঞান করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিতে এখন আর পারেন না। সকল কাজেই ইতস্তত করেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়।

একদিন উদয়াদিত্য শুনিলেন, ছাপরার জমিদারের কাছারিতে রাত্রিযোগে লাঠিয়াল পাঠাইয়া কাছারি লুট করিবার ও কাছারিতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে কহিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া চারিদিক দেখিলেন। কী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিলেন। ভৃত্য আসিয়া কহিল,

"যুবরাজ, অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছে। কোথায় যাইতে হইবে?" যুবরাজ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও অবশেষে কহিলেন, "কোথাও না। তুমি অশ্ব লইয়া যাও।"

একদিন এক ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া উদয়াদিত্য বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলেন, রাজকর্মচারী এক প্রজাকে বাঁধিয়া মারিতেছে। প্রজা কাঁদিয়া যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দোহাই যুবরাজ"। যুবরাজ তাহার যন্ত্রণা দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগে হইলে ফলাফল বিচার না করিয়া কর্মচারীকে বাধা দিতেন, প্রজাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেছে! তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে যুবরাজের আর সাহস হয় না। যখনই তাহাদের কষ্টের কথা শুনেন, তখনই মনে করেন, "আজই আমি টাকা পাঠাইয়া দিব।" তাহার পরেই ইতস্তত করিতে থাকেন, পাঠানো আর হয় না।

কেহ যেন না মনে করেন, উদয়াদিত্য প্রাণের ভয়ে এরূপ করিতেছেন। সম্প্রতি জীবনের প্রতি তাঁহার যে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে তাহা নহে। তাঁহার মনে একটা অন্ধ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে তিনি যেন রহস্যময় কী একটা মনে করেন। যেন উদয়াদিত্যের অদৃষ্ট, উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত প্রতাপাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। উদয়াদিত্য যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে অবস্থান করিতেছেন, তখনও যদি প্রতাপাদিত্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাঁচিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তখনও তাঁহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবা রুক্মিণীর (মঙ্গলার) কিঞ্চিৎ নগদ টাকা আছে। সেই টাকা খাটাইয়া সুদ লইয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে। রূপ এবং রুপা এই দুয়ের জোরে সে অনেককে বশে রাখিয়াছে। সীতারাম শৌখিন লোক, অথচ ঘরে এক পয়সার সংস্থান নাই, এইজন্য রুক্মিণীর রূপ ও রুপা উভয়ের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান আছে। যেদিন ঘরে হাঁড়ি কাঁদিতেছে, সেদিন সীতারামকে দেখো, দিব্য নিশ্চিন্ত মুখে হাতে লাঠি লইয়া পাতলা চাদর উড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতেছে, মঙ্গলার বাড়ি যাইবে। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কেমন হে সীতারাম,সংসার কেমন চলিতেছে?" সীতারাম তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলে, "বেশ চলিতেছে। কাল আমাদের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল।" সীতারামের বড়ো বড়ো কথাগুলা কিছুমাত্র কমে নাই, বরঞ্চ অবস্থা যতই মন্দ হইতেছে কথার পরিমাণ লম্বা ও চওড়ার দিকে ততই বাড়িতেছে। সীতারামের অবস্থা বড়ো মন্দ হইতে চলিল। সম্প্রতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পিসা তাঁহার অনরারি পিসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মানস করিতেছেন।

আজ টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, সীতারাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়াছে। হাসিয়া কাছে ঘেঁষিয়া কহিল–

"ভিক্ষা যদি দিবে রাই,
(আমার) সোনা রুপায় কাজ নাই,
(আমি) প্রাণের দায়ে এসেছি হে,
মান রতন ভিক্ষা চাই।

না ভাই, ছড়াটা ঠিক খাটিল না। মান রতনে আমার আপাতত তেমন আবশ্যক নাই, যদি আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইবে, আপাতত কিঞ্চিৎ সোনা রুপা পাইলে কাজে লাগে।"

রুক্মিণী সহসা বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা তোমার যদি আবশ্যক হইয়া থাকে তো তোমাকে দিব না তো কাহাকে দিব?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "নাঃ– আবশ্যক এমনই কী। তবে কী জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। আজ সকালে মা জোড়াঘাটায় তাঁর জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন। টাকা বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেছেন। তা আমি কালই শোধ করিয়া দিব।"

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "তোমার অত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কী? যখন সুবিধা হয় শোধ দিলেই হইবে। তোমার হাতে দিতেছি, এ তো আর জলে ফেলিয়া দিতেছি না।" জলে ফেলিয়া দিলেও বরঞ্চ পাইবার সম্ভাবনা আছে, সীতারামের হাতে দিলে সে সম্ভাবনাটুকুও নাই, এই প্রভেদ।

মঙ্গলার এইরূপ অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া সীতারামের ভালোবাসা একেবারে উথলিয়া উঠিল। সীতারাম রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিল। বিনা টাকায় নবাবি করা ও বিনা হাস্যরসে রসিকতা করা সীতারামের স্বভাবসিদ্ধ। সে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে ও আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাসিতে থাকে। তাহার হাসি দেখিয়া হাসি পায়। সে যখন রাজবাড়ির প্রহরী ছিল, তখন অন্যান্য প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উদ্যোগ হইত, তাহার প্রধান কারণ,সীতারাম যাহাকে মজা মনে করিত আর-সকলে তাহাকে মজা মনে করিত না। হনুমানপ্রসাদ তেওয়ারি পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতেছিল, সীতারাম আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত

একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। সীতারাম উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হনুমানপ্রসাদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া কিলের সহিত হাস্যরসের প্রভেদ ও করুণ রসের সম্বন্ধ উদাহরণ দ্বারা সীতারামকে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সীতারামের রসিকতার এমন আরো শত শত গল্প এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সীতারামের অনুরাগ সহসা উথলিয়া উঠিল, সে রুক্মিণীর কাছে ঘেঁষিয়া প্রীতিভরে কহিল, "তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ!"

রুক্মিণী কহিল, "মর্ মিনসে। সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন!"

সীতারাম কহিল, "তাহা কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।"

রুক্মিণী হাসিতে লাগিল, সীতারাম বুক ফুলাইয়া কহিল, "না, তা হইবে না, হাসিলে হইবে না, জবাব দাও। সুভদ্রা যদি বোনই হইল তবে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।"

সীতারামের বিশ্বাস যে, সে এমন প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে যে, ইহার উপরে আর কথা কহিবার জো নাই।

রুক্মিণী অতি মিষ্টস্বরে কহিল, "দূর মূর্খ।"

সীতারাম গলিয়া গিয়া কহিল, "মূর্খই তো বটে, তোমার কাছে আমি তো ভাই হারিয়াই আছি, তোমার কাছে আমি চিরকাল মূর্খ।" সীতারাম মনে মনে ভাবিল, খুব জবাব দিয়াছি, বেশ কথা জোগাইয়াছে।

আবার কহিল, "আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হইল, কী বলিয়া ডাকিলে তুমি খুশি হইবে, আমাকে বলো।"

রুক্মিণী হাসিয়া কহিল, "বলো প্রাণ।"

সীতারাম কহিল, "প্রাণ।"

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রিয়ে।”

সীতারাম কহিল, “প্রিয়ে।”

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রিয়তমে।”

সীতারাম কহিল, “প্রিয়তমে।”

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রাণপ্রিয়ে।”

সীতারাম কহিল, “প্রাণপ্রিয়ে। আচ্ছা ভাই প্রাণপ্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে,তাহার সুদ কত লইবে?”

রুক্মিণী রাগ করিল, মুখ বাঁকাইয়া কহিল, “যাও, যাও, এই বুঝি তোমার ভালোবাসা। সুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করিলে?”

সীতারাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, “না না, সে কি হয়? আমি কি ভাই সত্য বলিতেছিলাম? আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না? ছি প্রিয়তমে।”

সীতারামের মায়ের কী রোগ হইল জানি না, আজকাল প্রায় মাঝে মাঝে সে জামাইবাড়ি যাইতে লাগিল ও টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কাজেই সীতারামকে প্রায় মাঝে মাঝে রুক্মিণীর কাছে আসিতে হইত। আজকাল দেখা যায় সীতারাম ও রুক্মিণীতে মিলিয়া অতি গোপনে কী একটা বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। অনেকদিন পরামর্শের পর সীতারাম কহিল, “আমার ভাই অত ফন্দী আসে না, এ বিষয়ে ভাগবতের সাহায্য না লইলে চলিবে না।”

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্তত দুমদাম করিয়া দরজা পড়িতেছে। বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড়ো বড়ো গাছের শাখা হেলিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। বন্যার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মতো ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ

ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন। উদয়াদিত্য চারিদিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোটো মেয়েকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। মেয়েটি কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরমা যখন বাঁচিয়া ছিল, এই মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিত। সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠান নাই। অনেক দিনের পর সে আজ একবার রাজবাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সহসা উদয়াদিত্যকে দেখিয়া "কাকা" "কাকা" বলিয়া সে তাঁহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। উদয়াদিত্য তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার শয়নগৃহে লইয়া আসিয়াছেন। উদয়াদিত্যের মনের ভাব এই যে, সুরমা এই মেয়েটিকে যদি একবার দেখিতে আসে। ইহাকে যে সে বড়ো ভালোবাসিত। এত স্নেহের ছিল, সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে। মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা, কাকীমা কোথায়?"

উদয়াদিত্য রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "একবার তাঁহাকে ডাক্ না।" মেয়েটি "কাকীমা" "কাকীমা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের মনে হইল, ওই যেন কে সাড়া দিল। দূর হইতে ওই যেন কে বলিয়া উঠিল, "এই যাই রে।" যেন স্নেহের মেয়েটির করুণ আহ্বান শুনিয়া স্নেহময়ী আর থাকিতে পারিল না, তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিতেছে। বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিয়া অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্তত খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ওই না পদশব্দ শুনা গেল? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়্দুড়্ করিতেছে যে, শব্দ ভালো শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল। ইহাও কি কখনো সম্ভব। দীপ হস্তে চুপি চুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, "সুরমা কি?" পাছে সুরমাকে দেখিলে সুরমা চলিয়া যায়। পাছে সুরমা না হয়।

রমণী প্রদীপ রাখিয়া কহিল, “কেন গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না।”

বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিল। উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন। মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া “কাকা” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে বিছানার উপরে ফেলিয়া উদয়াদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কী করিবেন কোথায় যাইবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। রুক্মিণী কাছে আসিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, “বলি, এখন তো মনে পড়িবেই না। তবে এককালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে?” উদয়াদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন রুক্মিণী তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। কাঁদিয়া কহিল, “আমি তোমার কী দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমিই তো আমার সর্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী যুবরাজকে একদিন দেহপ্রাণ বিকাইয়াছে সে আজ ভিখারিনীর মতো পথে পথে বেড়াইতেছে। এ পোড়া কপালে বিধাতা কি এই লিখিয়াছিল?”

এইবার উদয়াদিত্যের প্রাণে গিয়া আঘাত লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল আমিই বুঝি ইহার সর্বনাশ করিয়াছি। অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কি করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আবর্তের মতো তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল– সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। দেখিলেন রুক্মিণীর বসন মলিন, ছিন্ন। রুক্মিণী কাঁদিতেছে। করুণহৃদয় উদয়াদিত্য কহিলেন, “তোমার কী চাই?”

রুক্মিণী কহিল, “আমার আর কিছু চাই না, আমার ভালোবাসা চাই। আমি ওই বাতায়নে বসিয়া তোমার বুকে মুখ রাখিয়া তোমার সোহাগ পাইতে চাই। কেন গা, সুরমার চেয়ে

কি এ মুখ কালো? যদি কালোই হইয়া থাকে তো সে তোমার জন্যই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া। আগে তো কালো ছিল না!"

এই বলিয়া রুক্মিণী উদয়াদিত্যের শয্যার উপর বসিতে গেল। উদয়াদিত্য আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও বিছানায় বসিয়ো না, বসিয়ো না।"

রুক্মিণী আহত ফণিনীর মতো মাথা তুলিয়া বলিল, "কেন বসিব না?"

উদয়াদিত্য তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন, "না, ও বিছানার কাছে তুমি যাইয়ো না। তুমি কী চাও আমি এখনই দিতেছি।"

রুক্মিণী কহিল, "আচ্ছা তোমার আঙুলের ওই আংটিটি দাও।"

উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রুক্মিণী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল ডাকিনীর মন্ত্রমোহ এখনো দূর হয় নাই, আরো কিছুদিন যাক, তাহার পর আমার মন্ত্র খাটিবে। রুক্মিণী চলিয়া গেলে উদয়াদিত্য শয্যার উপরে আসিয়া পড়িলেন। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "কোথায়, সুরমা কোথায়। আজ আমার এ দগ্ধ বজ্রাহত হৃদয়ে শান্তি দিবে কে?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগবতের অবস্থা বড়ো ভালো নহে। সে চুপচাপ বসিয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত তামাক ফুঁকিতেছে। ভাগবত যখন মনোযোগের সহিত তামাক ফুঁকিতে থাকে, তখন প্রতিবেশীদের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। কারণ, তাহার মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তাহার মনের মধ্যেও তেমনি একটা কৃষ্ণবর্ণ পাকচক্রের কারখানা চলিতে থাকে। কিন্তু ভাগবত লোকটা বড়ো ধর্মনিষ্ঠ। সে কাহারও সঙ্গে মেশে না এই যা তাহার দোষ, হরিনামের মালা লইয়া থাকে, অধিক কথা কয় না, পরচর্চায় থাকে না। কিন্তু কেহ যখন ঘোরতর বিপদে পড়ে, তখন ভাগবতের মতো পাকা পরামর্শ দিতে আর কেহ পারে না। ভাগবত কখনো ইচ্ছা করিয়া পরের অনিষ্ট করে না, কিন্তু আর কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে, তবে ভাগবত ইহজন্মে তাহা কখনো ভোলে না, তাহার শোধ তুলিয়া তবে সে হুঁকা নামাইয়া রাখে। এক কথায়, সংসারে যাহাকে ভালো বলে, ভাগবত তাহাই। পাড়ার লোকেরাও তাহাকে মান্য করে, দুরবস্থায় ভাগবত ধার করিয়াছিল, কিন্তু ঘটিবাটি বেচিয়া তাহা শোধ করিয়াছে।

একদিন সকালে সীতারাম আসিয়া ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কেমন আছ হে?"

ভাগবত কহিল, "ভালো না।"

সীতারাম কহিল, "কেন বলো দেখি?"

ভাগবত কিয়ৎক্ষণ তামাক টানিয়া সীতারামের হাতে হুঁকা দিয়া কহিল, "বড়ো টানাটানি পড়িয়াছে।"

সীতারাম কহিল, "বটে? তা কেমন করিয়া হইল?"

ভাগবত মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেমন করিয়া হইল? তোমাকেও তাহা বলিতে হইবে নাকি? আমি তো জানিতাম আমারও যে দশা তোমারও সে দশা।"

সীতারাম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "না হে, আমি সে কথা কহিতেছি না, আমি বলিতেছি তুমি ধার কর না কেন?"

ভাগবত কহিল, "ধার করিলে তো শুধিতে হইবে। শুধিব কী দিয়া? বিক্রি করিবার ও বাঁধা দিবার জিনিস বড়ো অধিক নাই।"

সীতারাম সগর্বে কহিল, "তোমার কত টাকা ধার চাই, আমি দিব।"

ভাগবত কহিল, "বটে? তা এতই যদি তোমার টাকা হইয়া থাকে যে এক মুঠা জলে ফেলিয়া দিলেও কিছু না আসে যায়, তা হইলে আমাকে গোটা দশেক দিয়া ফেলো। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই!"

সীতারাম কহিল, "সেজন্যে দাদা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সীতারামের কাছে এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা পাইয়া ভাগবত বন্ধুতার উচ্ছ্বাসে যে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। আর-এক ছিলিম তামাক সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল।

সীতারাম আস্তে আস্তে কথা পাড়িল, "দাদা, রাজার অন্যায় বিচারে আমাদের তো অন্ন মারা গেল।"

ভাগবত কহিল, "কই তোমার ভাবে তো তাহা বোধ হইল না!" সীতারামের বদান্যতা ভাগবতের বড়ো সহ্য হয় নাই, মনে মনে কিছু চটিয়াছিল।

সীতারাম কহিল, "না ভাই, কথার কথা বলিতেছি! আজ না যায় তো দশ দিন পরে তো যাইবে।"

ভাগবত কহিল, "তা রাজা যদি অন্যায় বিচার করেন তো আমরা কী করিতে পারি।"

সীতারাম করিল, "আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবে, তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে, ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।"

ভাগবত চটিয়া গিয়া কহিল, "ও-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই? তুমি বড়ো-মানুষ লোক, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া রাজা-উজির মার, সে শোভা পায়। আমি গরিব মানুষ, আমার অতটা ভরসা হয় না।"

সীতারাম কহিল, "রাগ কর কেন দাদা? কথাটা মন দিয়া শোনোই না কেন?" বলিয়া চুপি চুপি কী বলিতে লাগিল।

ভাগবত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দেখো সীতারাম, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমার কাছে অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।"

সীতারাম সেদিন তো চলিয়া গেল। ভাগবত ভারি মনোযোগ দিয়া সমস্ত দিন কী একটা ভাবিতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালবেলায় সে নিজে সীতারামের কাছে গেল। সীতারামকে কহিল, "কাল যে কথাটা বলিয়াছিলে বড়ো পাকা কথা বলিয়াছিলে।"

সীতারাম গর্বিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "কেমন দাদা, বলি নাই!"

ভাগবত কহিল, "আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

সীতারাম আরো গর্বিত হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমিক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল তাহা এই, একটা জাল দরখাস্ত লিখিতে হইবে, যেন যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন। তাহাতে যুবরাজের সীলমোহর মুদ্রিত থাকিবে। রুক্মিণী যে আংটিটি লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের নাম-মুদ্রাঙ্কিত সীল আছে, অতএব কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে।

পরামর্শমতো কাজ হইল। একখানা জাল দরখাস্ত লেখা হইল, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রিত রহিল। নির্বোধ সীতারামের উপর নির্ভর করা যায় না, অতএব স্থির হইল, ভাগবত নিজে দরখাস্ত লইয়া দিল্লীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ভাগবত সেই দরখাস্তখানি লইয়া দিল্লির দিকে না গিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। মহারাজকে কহিল, "উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লির দিকে যাইতেছিল, আমি কোনো সূত্রে জানিতে পারি। ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে, দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজের নিকট আসিতেছি।" ভাগবত সীতারামের নাম করে নাই। দরখাস্ত পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের কী অবস্থা হইল তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। ভাগবতের পুনর্বার রাজবাড়িতে চাকরি হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কী যেন একটা মর্মভেদী দুঃখ, একটা মরুময়ী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতিমুহূর্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবনশূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্ক সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারই একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। বিভার মনের ভিতরে কেমন করিতেছে। বিভা বিছানায় একেলা পড়িয়া আছে। এ-সময়ে বিভার কাছে কেহ নাই। বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া, বিভা কাঁদিয়া, বিভা আকুল হইয়া কহিল, "আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছি?" কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, "আমি কী অপরাধ করিয়াছি?" দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া বালিশ বুকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার করিয়া কহিল, "আমি কী করিয়াছি? একখানি পত্র না, একটি লোকও আসিল না, কাহারও মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না। আমি কী করিব? বুক ফাটিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারও মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না। মা গো মা, দিন কী করিয়া কাটিবে।" এমন কত দিন গেল। এমন কত মধ্যাহ্নে কত অপরাহ্নে কত রাত্রে সঙ্গিহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মতো ঘুরিয়া বড়োয়।

এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে রামমোহন আসিয়া "মা গো জয় হোক" বলিয়া প্রণাম করিল, বিভা এমনই চমকিয়া উঠিল, যেন তাহার মাথায় একটা সুখের বজ্র ভাঙিয়া

পড়িল। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইল। সে সচকিত হইয়া কহিল, "মোহন, তুই এলি!"

"হাঁ মা, দেখিলাম, মা আমাদের ভুলিয়া গেছেন, তাঁহাকে একবার স্মরণ করাইয়া আসি।"

বিভা কত কী জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল কিন্তু লজ্জায় পারিল না– বলে বলে করিয়া হইয়া উঠিল না, অথচ শুনিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া রহিল।

রামমোহন বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন মা, তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন? তোমার চোখে কালি পড়িয়াছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ। এস মা, আমাদের ঘরে এস। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই।"

বিভা ম্লান হাসি হাসিল, কিছু কহিল না। হাসিতে হাসিতে হাসি আর রহিল না। দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল– শীর্ণ বিবর্ণ দুটি কপোল প্লাবিত করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অশ্রু আর থামে না। বহুদিন অনাদরের পর একটু আদর পাইলে যে অভিমান উথলিয়া উঠে, বিভা সেই অতিকোমল মৃদু অনন্তপ্রীতিপূর্ণ অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, "এতদিন পরে কি আমাকে মনে পড়িল?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিল, কহিল, "এ কী অলক্ষণ। মা লক্ষ্মী, তুমি হাসিমুখে আমাদের ঘরে এস। আজ শুভদিনে চোখের জল মোছো।"

মহিষীর মনে মনে ভয় ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে গ্রহণ না করে। রামমোহন বিভাকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি রামমোহনকে ডাকাইয়া জামাইবাড়ি'র কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ যত্নে রামমোহনকে আহার করাইলেন, রামমোহনের গল্প শুনিলেন, আনন্দে দিন কাটিল। কাল যাত্রার দিন ভালো, কাল প্রভাতেই বিভাকে পাঠাইবেন স্থির হইল। প্রতাপাদিত্য এ-বিষয়ে আর কিছু আপত্তি করিলেন না।

যাত্রার যখন সমস্তই স্থির হইয়া গেছে, তখন বিভা একবার উদয়াদিত্যের কাছে গেল। উদয়াদিত্য একাকী বসিয়া কী একটা ভাবিতেছিল।

বিভাকে দেখিয়া সহসা ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলেন, "বিভা, তবে তুই চলিলি? তা ভালোই হইল। তুই সুখে থাকিতে পারিবি। আশীর্বাদ করি লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাক্।"

বিভা উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, বিভার মাথায় হাত দিয়া তিনি কহিলেন, "কেন কাঁদিতেছিস্? এখানে তোর কী সুখ ছিল বিভা, চারি দিকে কেবল দুঃখ কষ্ট শোক। এ কারাগার হইতে পালাইলি– তুই বাঁচিলি।"

বিভা যখন উঠিল, তখন উদয়াদিত্য কহিলেন, "যাইতেছিস? তবে আয়। স্বামীগৃহে গিয়া আমাদের একেবারে যেন ভুলিয়া যাস নে। এক-একবার মনে করিস, মাঝে মাঝে যেন সংবাদ পাই।"

বিভা রামমোহনের কাছে গিয়া কহিল, "এখন আমি যাইতে পারিব না।"

রামমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কী কথা মা।"

বিভা কহিল, "না, আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট এত দুঃখ আর আমি আজ তাঁহাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে যাইব? যতদিন তাঁহার মনে তিলমাত্র কষ্ট থাকিবে, ততদিন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। এখানে আমার মতো তাঁহাকে কে যত্ন করিবে?" বলিয়া বিভা কাঁদিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। মহিষী আসিয়া বিভাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক পরামর্শ দিলেন। বিভা কেবল কহিল, "না মা, আমি পারিব না।"

মহিষী রোষে বিরক্তিতে কাঁদিয়া কহিলেন, "এমন মেয়েও তো কোথাও দেখি নাই।" তিনি মহারাজের কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। মহারাজ প্রশান্তভাবে কহিলেন, "তা বেশ তো, বিভার যদি ইচ্ছা না হয় তো কেন যাইবে?"

মহিষী অবাক হইয়া, হাত উল্‌টাইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করো, আমি আর কোনো কথায় থাকিব না।"

উদয়াদিত্য সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিভাকে আসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বিভা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভালো বুঝিল না।

হতাশ্বাস রামমোহন আসিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মা, তবে চলিলাম। মহারাজকে গিয়া কী বলিব।"

বিভা কিছু বলিতে পারিল না, অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল।

রামমোহন কহিল, "তবে বিদায় হই মা।" বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। বিভা একেবারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতর স্বরে ডাকিল, "মোহন।"

মোহন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কী মা?"

বিভা কহিল, "মহারাজকে বলিয়ো, আমাকে যেন মার্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুরদৃষ্ট।"

রামমোহন শুষ্কভাবে কহিল, "যে আজ্ঞা।"

রামমোহন আবার প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বিভা দেখিল, রামমোহন বিভার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহার ভারি গোলমাল ঠেকিয়াছে। একে তো বিভার প্রাণ

যেখানে যাইতে চায়, বিভা সেখানে যাইতে পারিল না। তাহার উপর রামমোহন, যাহাকে সে যথার্থ স্নেহ করে, সে আজ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিভার প্রাণে যাহা হইল তাহা বিভাই জানে।

বিভা রহিল। চোখের জল মুছিয়া প্রাণের মধ্যে পাষাণভার বহিয়া সে তাহার দাদার কাছে পড়িয়া রহিল। ম্লান শীর্ণ একখানি ছায়ার মতো সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য স্নেহ করিয়া আদর করিয়া কোনো কথা কহিলে চোখ নিচু করিয়া একটুখানি হাসে। সন্ধ্যাবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসিয়া একটু কথা কহিতে চেষ্টা করে। যখন মহিষী তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে ও অবশেষে একখণ্ড মলিন মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়; যখন কেহ বিভার চিবুক ধরিয়া বলে, “বিভা, তুই এত রোগা হইতেছিস কেন?” বিভা কিছু বলে না, কেবল একটু হাসে।

এই সময়ে ভাগবত পূর্বোক্ত জাল দরখাস্তটি লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দেখায়, প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া উঠিলেন, পরে অনেক বিবেচনা করিয়া উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, যুবরাজ যে এ কাজ করিয়াছেন, ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না। যে শোনে সেই জিভ কাটিয়া বলে, ও-কথা কানে আনিতে নাই। যুবরাজ এ-কাজ করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।” প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আমারও তো বড়ো একটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কারাগারে থাকিতে দোষ কী? সেখানে কোনোপ্রকার কষ্ট না দিলেই হইল। কেবল গোপনে কিছু না করিতে পারে, তাহার জন্য পাহারা নিযুক্ত থাকিবে।”

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যখন রামমোহন চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া গিয়া একাকী জোড়হস্তে অপরাধীর মতো রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তখন রামচন্দ্র রায়ের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন বিভা আসিলে পর তাহাকে প্রতাপাদিত্য ও তাহার বংশ সম্বন্ধে খুব দু-চারটি খরধার কথা শুনাইয়া তাঁহার শ্বশুরের উপর শোধ তুলিবেন। কী কী কথা বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, কখন বলিবেন, সমস্ত তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রায় গোঁয়ার নহেন, বিভাকে যে কোনোপ্রকারে পীড়ন করিবেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কেবল বিভাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব লজ্জা দিবেন এই আনন্দেই তিনি অধীর ছিলেন। এমন কি এই আনন্দের প্রভাবে তাঁহার মনেই হয় নাই যে, বিভার আসিবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিতে পারে। এমন সময়ে রামমোহনকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র রায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী হইল, রামমোহন?"

রামমোহন কহিল, "সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আনিতে পারিলি না?"

রামমোহন। আজ্ঞা, না মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলাম।

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেটা তোকে যাত্রা করিতে কে বলিয়াছিল? তখন তোকে বার বার করিয়া বারণ করিলাম, তখন যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি, আর আজ–"

রামমোহন কপালে হাত দিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।"

রামচন্দ্র রায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম করিয়া ভিক্ষা চাহিতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিল না। এত বড়ো অপমান আমাদের বংশে কখনো হয় নাই।”

তখন রামমোহন নতশির তুলিয়া ঈষৎ গর্বিতভাবে কহিল, “ও-কথা বলিবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিত, আমি কাড়িয়া আনিতাম। আপনার কাছে তাহা তো বলিয়াই গিয়াছিলাম। মহারাজ, যখন আপনার আদেশ পালন করিতে যাই, তখন কি আর প্রতাপাদিত্যকে ভয় করি? প্রতাপাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু আমার রাজা তো সে নয়।”

রাজা কহিলেন, “তবে হইল না কেন?”

রামমোহন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জল দেখা দিল।

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, “রামমোহন, শীঘ্র বল্!”

রামমোহন জোড়হাতে কহিল, “মহারাজ–

রাজা কহিলেন, “কী বল্।”

রামমোহন। মহারাজ, মা-ঠাকরুন আসিতে চাহিলেন না।

বলিয়া রামমোহনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বুঝি এ সন্তানের অভিমানের অশ্রু। বোধ করি এ অশ্রুজলের অর্থ– “মায়ের প্রতি আমার এত বিশ্বাস ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে আমি বুক ফুলাইয়া আনন্দ করিয়া মাকে আনিতে গেলাম আর মা আসিলেন না, মা আমার সম্মান রাখিলেন না।” কী জানি কী মনে করিয়া বৃদ্ধ রামমোহন চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

রাজা কথাটা শুনিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বটে।” অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

"আসিতে চাহিলেন না, বটে! বেটা, তুই বেরো, বেরো, আমার সম্মুখ হইতে এখনই বেরো।"

রামমোহন একটি কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, অতএব সমুচিত দণ্ড পাওয়া কিছু অন্যায় নহে।

রাজা কী করিয়া ইহার শোধ তুলিবেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের কিছু করিতে পারিবেন না, বিভাকেও হাতের কাছে পাইতেছেন না। রামচন্দ্র রায় অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন-দুয়েকের মধ্যে সংবাদটা নানা আকারে নানা দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রতিশোধ না লইলে আর মুখ রক্ষা হয় না। এমন কি, প্রজারা পর্যন্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহারা কহিল, "আমাদের মহারাজার অপমান!" অপমানটা যেন সকলের গায়ে লাগিয়াছে। একে তো প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রামচন্দ্র রায়ের মনে স্বভাবতই বলবান আছে, তাহার উপরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিহিংসা না লইলে প্রজারা কী মনে করিবে, ভৃত্যেরা কী মনে করিবে, রমাই ভাঁড় কী মনে করিবে? তিনি যখন কল্পনায় মনে করেন, এই কথা লইয়া রমাই আর-একজন ব্যক্তির কাছে হাসি-টিটকারি করিতেছে তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

এক দিন সভায় মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, "মহারাজ, আপনি আর-একটি বিবাহ করুন।"

রমাই ভাঁড় কহিল, "আর প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক।"

রাজা রমাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ রমাই।" রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সকল সভাসদই হাসিতে লাগিল। কেবল ফর্নাণ্ডিজ বিরক্ত হইল, সে হাসিল না। রামচন্দ্র রায়ের মতো লোকেরা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সততই ব্যস্ত, কিন্তু সম্ভ্রম কাহাকে বলে ও কী করিয়া সম্ভ্রম রাখিতে হয় সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

দেওয়ানজি কহিলেন, "মন্ত্রীমহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যকে ও তাঁহার কন্যাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

রমাই ভাঁড় কহিল, "এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে ভুলিবেন না, নহিলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন।" বলিয়া রমাই চোখ টিপিল। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিল। যাহারা দূরে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিতে পায় নাই, তাহারাও না হাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না।

রমাই কহিল, "বরণ করিবার নিমিত্ত এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়ীঠাকরুনকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন, তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠাইয়া দিবেন।"

রাজা হাসিয়া অস্থির হইলেন। সভাসদেরা মুখে চাদর দিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিতে লাগিল। ফর্নান্ডিজ অলক্ষিতভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ– যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে, তাহা হইলে তো যশোহরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হইয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর মিষ্টান্ন খাইবার উপযুক্ত লোক থাকে না।"

কথাটা শুনিয়া কাহারও হাসি পাইল না। রাজা চুপ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন, সভাসদেরা গম্ভীর হইয়া রহিল, রমাই দেওয়ানের দিকে একবার অবাক হইয়া চাহিল, এমন কি, একজন অমাত্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কী কথা দেওয়ানজি মহাশয়। রাজার বিবাহে মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত কি এত কম হইবে?" দেওয়ানজি মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত কারাগার নহে; তাহা প্রাসাদসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। বাটীর ঠিক ডানপাশেই এক রাজপথ ও তাহার পূর্বদিকে প্রশস্ত এক প্রাচীর আছে, তাহার উপর প্রহরীরা পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছে। ঘরেতে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা কাটা। তাহার মধ্য দিয়া খানিকটা আকাশ, একটা বাঁশঝাড় ও একটি শিবমন্দির দেখা যায়। উদয়াদিত্য প্রথম যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জানালার কাছে মুখ রাখিয়া ভূমিতে গিয়া বসিলেন। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দৈবাৎ দুই-একজন পথিক চলিতেছে, ছপ্ ছপ্ করিয়া তাহাদের পায়ের শব্দ হইতেছে। পূর্বদিক হইতে কারাগারের হৃৎস্পন্দন-ধ্বনির মতো প্রহরীদের পদশব্দ অনবরত কানে আসিতেছে। এক-এক প্রহর অতীত হইতে লাগিল, দূর হইতে এক-একটা হাঁক শোনা যাইতেছে। আকাশে একটিমাত্র তারা নাই। যে বাঁশঝাড়ের দিকে উদয়াদিত্য চাহিয়া আছেন তাহা জোনাকিতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে-রাত্রে উদয়াদিত্য আর শয়ন করিলেন না, জানালার কাছে বসিয়া প্রহরীদের অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন।

বিভা আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার অন্তঃপুরের বাগানে গিয়াছে। প্রাসাদে বোধ করি অনেক লোক। চারিদিকে দাসদাসী, চারিদিকেই পিসি মাসি, কথায় কথায় “কী হইয়াছে, কী বৃত্তান্ত” জিজ্ঞাসা করে, প্রতি অশ্রুবিন্দুর হিসাব দিতে হয়, প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসের বিস্তৃত ভাষ্য ও সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। বিভা বুঝি আর পারে নাই। ছুটিয়া বাগানে আসিয়াছে। সূর্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অস্ত গেল। কখন যে

দিনের অবসান হইল ও সন্ধ্যার আরম্ভ হইল বুঝা গেল না। বিকালের দিকে পশ্চিমের মুখে একটুখানি সোনার রেখা ফুটিয়াছিল, কিন্তু দিন শেষ হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। আঁধারের উপর আঁধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘনশ্রেণী ঝাউগাছগুলির মাথার উপর অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজবাড়ির প্রদীপ একে একে নিবিয়া গেল। বিভা ঝাউগাছের তলায় বসিয়া আছে। বিভা স্বভাবতই ভীরু, কিন্তু আজ তাহার ভয় নাই। কেবল যতই আঁধার বাড়িতেছে, ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে, যেন সুখ হইতে শান্তি হইতে জগৎ-সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, অতলস্পর্শ অন্ধকারে সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমেই ডুবিতেছে, ক্রমেই নামিতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছে, পদতলে ভূমি নাই, চারিদিকে কিছুই নাই। আশ্রয় উপকূল জগৎ-সংসার ক্রমেই দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন একটু একটু করিয়া তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপর কত কী পড়িয়া রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারে সকলই দেখা যাইতেছে; সেখানকার সূর্যালোক, খেলাধুলা, উৎসব সকলই দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুরভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার কাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সেদিকে যাইতে দিবে না। বিভা যেন আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছে; এই চরাচরব্যাপী ঘনঘোর অন্ধকারের উপর বিধাতা যেন বিভার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন, অনন্ত জগৎ-সংসারে একাকী বসিয়া বিভা যেন তাহাই পাঠ করিতেছে; তাই তাহার চক্ষে জল নাই,

দেহ নিস্পন্দ, নেত্র নির্নিমেষ। রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল, অন্ধকারে গাছপালাগুলা হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতি দূরে হূ হূ করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল, যেন দূর দূর দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না, যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন লক্ষ যোজন গাঢ় স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌঁছিল। বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, "কে রে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস, তোরা কোথায়।" বিভা মনে মনে যেন এই লক্ষ যোজন অন্ধকারের পথে একাকিনী যাত্রা করিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া যেন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিল, পথ শেষ হইল না, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল সেই বায়ুহীন শব্দহীন দিনরাত্রিহীন জনশূন্য তারাশূন্য দিগ্‌দিগন্তশূন্য মহান্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারি দিক হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইল, কেবল বাতাস দূর হইতে করিতে লাগিল হূ হূ।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন বিভা কারাগারে উদয়াদিত্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, সেখানে তাহার যাওয়া নিষেধ। সমস্ত দিন ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল। এমন কি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। বিভা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে সম্মতি পাইল। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই বিভা শয্যা হইতে উঠিয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল উদয়াদিত্য বিছানায় শোন নাই। ভূমিতলে বসিয়া বাতায়নের উপরে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দেখিয়া বিভার প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। অনেক কষ্টে রোদন সংবরণ করিল। অতি ধীরে নিঃশব্দে উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বসিল। ক্রমে প্রভাত পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের বন হইতে পাখিরা গাহিয়া উঠিল। পাশের রাজপথ হইতে পান্থেরা গান গাহিয়া উঠিল, দুই-

একটি রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত প্রহরী আলো দেখিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দির হইতে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ উঠিল। উদয়াদিত্য সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিভাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ কী বিভা, এত সকালে যে?" ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ কী, আমি কোথায়?" মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়িল, তিনি কোথায়। বিভার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আঃ! বিভা, তুই আসিয়াছিস? কাল তোকে সমস্তদিন দেখি নাই, মনে হইয়াছিল বুঝি তোদের আর দেখিতে পাইব না।" বিভা উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "দাদা, মাটিতে বসিয়া কেন? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, একবারও তুমি খাটে বস নাই। এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ?" বলিয়া বিভা কাঁদিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "খাটে বসিলে আমি যে আকাশ দেখিতে পাই না বিভা। জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনন্ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানালা হইতে যখন সরিয়া যাই, তখন চারি দিকে অন্ধকার দেখি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আমার একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে, মনে হয় না জীবনের বেড়ি একদিন ভাঙিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে এক দিন খালাস পাইব। বিভা, এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে, আমি স্বভাবতই স্বাধীন; কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আর ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা, ওইখানেই আমার কারাগার।"

আজ বিভাকে সহসা দেখিয়া উদয়াদিত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। বিভা যখন তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তাঁহার কারাগারের সমুদয় দ্বার যেন মুক্ত হইয়া গেল। সেদিন তিনি

বিভাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে এত কথা বলিয়াছিলেন যে কারাপ্রবেশের পূর্বে বোধ করি এত কথা কখনো বলেন নাই। বিভা উদয়াদিত্যের সে আনন্দ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল। জানি না, এক প্রাণ হইতে আর-এক প্রাণে কী করিয়া বার্তা যায়, এক প্রাণে তরঙ্গ উঠিলে আর-এক প্রাণে কী নিয়মে তরঙ্গ উঠে। বিভার হৃদয় পুলকে পুরিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের উদ্দেশ্য আজ সফল হইল। বিভা সামান্য বালিকা, উদয়াদিত্যকে সে যে আনন্দ দিতে পারে অনেক দিনের পর ইহা সে সহসা আজ বুঝিতে পারিল। হৃদয়ে সে বল পাইল। এতদিন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, কোথাও কিনারা পাইতেছিল না, নিরাশার গুরুভারে একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না; অনবরত সে উদয়াদিত্যের কাজ করিতে, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে। আজ সে সহসা একটা পথ দেখিতে পাইয়াছে, এতদিনকার সমস্ত শ্রান্তি একেবারে ভুলিয়া গেল। আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মতো অশ্রুজল দেখা দিল, আজ তাহার অধরে অরুণ-কিরণের নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনই প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাদ্বার খুলিয়া গিয়া তখনই বিভার বিমল মূর্তি দেখা দিত। বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদয় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত। একটি টিয়াপাখি আনিয়া ঘরে টাঙাইয়া দিল ও প্রতিদিন সকালে অন্তঃপুরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দিত। ঘরে একখানি মহাভারত ছিল, উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে বসাইয়া তাহাই পড়িয়া শুনাইতেন।

কিন্তু উদয়াদিত্যের মনের ভিতর একটি কষ্ট জাগিয়া আছে। তিনি তো ডুবিতেই বসিয়াছেন, তবে কেন এমন সময়ে এই অসম্পূর্ণ-সুখ অতৃপ্ত-আশা সুকুমার বিভাকে

আশ্রয়স্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে পর্যন্ত ডুবাইতেছেন? প্রতিদিন মনে করেন, বিভাকে বলিবেন, "তুই যা বিভা।" কিন্তু বিভা উষার বাতাস লইয়া উষার আলোক লইয়া তরুণী উষার হাত ধরিয়া কারার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সেই স্নেহের ধন সুকুমার মুখখানি লইয়া কাছে আসিয়া বসে, কত যত্ন কত আদরের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখে, কত মিষ্ট স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি আর কোনোমতেই প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন না, "বিভা, তুই যা, তুই আর আসিস না, তোকে আর দেখিব না।" প্রত্যহ মনে করেন, কাল বলিব। কিন্তু সে কাল আর কিছুতেই আসিতে চায় না। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিভা আসিল, বিভাকে বলিলেন, "বিভা, তুই আর এখানে থাকিস নে। তুই না গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই কারাগৃহের অন্ধকারে কে আসিয়া আমাকে যেন বলে, বিভার বিপদ কাছে আসিতেছে। বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পালাইয়া যা। আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারিদিক হইতে দেশের বিপদ ছুটিয়া আসে। তুই শ্বশুরবাড়ি যা। মাঝে মাঝে যদি সংবাদ পাই, তাহা হইলেই আমি সুখে থাকিব।"

বিভা চুপ করিয়া রহিল।

উদয়াদিত্য মুখ নত করিয়া বিভার সেই মুখখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, "আমি কারাগার হইতে না মুক্ত হইলে বিভা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, কী করিয়া মুক্ত হইতে পারিব।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় ভাবিলেন, বিভা যে চন্দ্রদ্বীপে আসিল না, সে কেবল প্রতাপাদিত্যের শাসনে ও উদয়াদিত্যের মন্ত্রণায়। বিভা যে নিজের ইচ্ছায় আসিল না, তাহা মনে করিলে তাঁহার আত্মগৌরবে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন প্রতাপাদিত্য আমাকে অপমান করিতে চাহে, অতএব সে কখনো বিভাকে আমার কাছে পাঠাইবে না। কিন্তু এ অপমান আমিই তাহাকে ফিরাইয়া দিই না কেন। আমিই তাহাকে এক পত্র লিখি না কেন যে তোমার মেয়েকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাকে যেন আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠানো না হয়। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া পাঁচজনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ওই মর্মে এক পত্র লেখা হইল। প্রতাপাদিত্যকে এরূপ চিঠি লেখা বড়ো সাধারণ সাহসের কর্ম নহে। রামচন্দ্র রায়ের মনে মনে বিলক্ষণ ভয় হইতেছিল। কিন্তু ঢালু পর্বতে বেগে নামিতে নামিতে হাজার ভয় হইলেও যেমন মাঝে মাঝে থামা যায় না, রামচন্দ্র রায়ের মনেও সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। সহসা একটা দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত না পৌঁছিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। রামমোহনকে ডাকিয়া কহিলেন, “এই পত্র যশোহরে লইয়া যা।” রামমোহন জোড়হস্তে কহিল, “আজ্ঞা না মহারাজ, আমি পারিব না। আমি স্থির করিয়াছি আর যশোহরে যাইব না। এক যদি পুনরায় মা-ঠাকুরানীকে আনিতে যাইতে বলেন তো আর-একবার যাইতে পারি, নতুবা এ চিঠি লইয়া যাইতে পারিব না।” রামমোহনকে আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ নয়ানচাঁদের হাতে রাজা সেই পত্রখানি দিলেন। সে সেই পত্র লইয়া যশোহরে যাত্রা করিল।

পত্র লইয়া গেল বটে, কিন্তু নয়ানচাঁদের মনে বড়ো ভয় হইল। প্রতাপাদিত্যের হাতে এ পত্র পড়িলে না জানি তিনি কী করিয়া বসেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিষীর হাতে সে এই পত্র দিতে সংকল্প করিল। মহিষীর মনের অবস্থা বড়ো ভালো নয়। একদিকে বিভার জন্য তাঁহার ভাবনা, আর-একদিকে উদয়াদিত্যের জন্য তাঁহার কষ্ট। সংসারের গোলমালে তিনি যেন একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রায় তাঁহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। তাঁহার যেন আর ঘরকন্নায় মন লাগে না। এইরূপ অবস্থায় তিনি এই পত্রখানি পাইলেন– কী যে করিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। বিভাকে কিছু বলিতে পারেন না, তাহা হইলে সুকুমার বিভা বাঁচিবে না। মহারাজের কানে এ চিঠির কথা উঠিলে কী যে অনর্থপাত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। অথচ এমন সংকটের অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও নিকট কোনো পরামর্শ না লইয়া মহিষী বাঁচিতে পারেন না, চারিদিক অকূল পাথার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কহিলেন, "মহারাজ, বিভার তো যাহা হয় একটা কিছু করিতে হইবে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "কেন বলো দেখি?"

মহিষী কহিলেন, "নাঃ, কিছু যে হইয়াছে তাহা নহে তবে বিভাকে তো এক সময়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতেই হইবে।"

প্রতাপাদিত্য। "সে তো বুঝিলাম, তবে এতদিন পরে আজ যে সহসা তাহা মনে পড়িল?"

মহিষী ভীত হইয়া কহিলেন, "ওই তোমার এক কথা, আমি কি বলিতেছি যে কিছু হইয়াছে? যদি কিছু হয়–"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "হইবে আর কী?"

মহিষী। "এই মনে করো যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।" বলিয়া মহিষী রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইল।

মহারাজের সেই মূর্তি দেখিয়া মহিষী চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্য সত্যই লিখিয়াছে যে, ওগো তোমাদের বিভাকে আমি ত্যাগ করিলাম, তাহাকে আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইয়ো না, তাহা নহে– তবে কথা এই, যদি কোনোদিন তাই লিখিয়া বসে!"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "তখন তাহার বিহিত বিধান করিব, এখন তাহার জন্য ভাবিবার অবসর নাই।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "মহারাজ তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা রাখো, একবার ভাবিয়া দেখো বিভার কী হইবে। আমার পাষাণ প্রাণ বলিয়া আজও রহিয়াছে, নহিলে আমাকে যত দূর যন্ত্রণা দিবার তা দিয়াছ। উদয়কে– আমার বাছাকে– রাজার ছেলেকে সামান্য অপরাধীর মতো রুদ্ধ করিয়াছ। সে আমার কাহারও কোনো অপরাধ করে না, কিছুতেই লিপ্ত থাকে না, দোষের মধ্যে সে কিছু বোঝে সোঝে না, রাজকার্য শেখে নাই, প্রজা শাসন করিতে জানে না, তাহার বুদ্ধি নাই, তা ভগবান তাহাকে যা করিয়াছেন, তাহার দোষ কী।" বলিয়া মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ও-কথা তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। যে-কথা হইতেছিল তাহাই বলো না।"

মহিষী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "আমারই পোড়া কপাল! বলিব আর কী? বলিলে কি তুমি কিছু শোন? একবার বিভার মুখপানে চাও, মহারাজ। সে যে কাহাকেও কিছু বলে না– সে কেবল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়, ছায়ার মতো হইয়া আসে, কিন্তু সে কথা কহিতে জানে না। তাহার একটা উপায় করো।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহিষী আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে। যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন সে আর হাত-পা আছড়াইয়া বাঁচে না। প্রথমেই তো সে রুক্মিণীর বাড়ি গেল। তাহাকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। তাহাকে মারিতে যায় আর কি। কহিল, "সর্বনাশী, তোর ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম। আজই আমি রায়গড়ে চলিলাম, রায়গড় হইতে আসি, তার পরে তোর ওই কালামুখ লইয়া এই শানের উপর ঘষিব, তোর মুখে চুনকালি মাখাইয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে জলগ্রহণ করিব।"

রুক্মিণী কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল, ক্রমে তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিল, ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিল, তাহার হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল, তাহার ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারকায় বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হইয়া গেল; ক্রমে তাহার স্থূল অধরৌষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ঘন ভ্রূ তরঙ্গিত হইল, অন্ধকার চক্ষে বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল, কেশরাশি ফুলিয়া উঠিল, হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটা পৈশাচিক অভিশাপ, একটা সর্বাঙ্গস্ফীত কম্পমান হিংসা সীতারামের মাথার উপরে যেন পড়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে যখন রুক্মিণীর মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, দাঁত খুলিয়া গেল, অধরৌষ্ঠ পৃথক হইল, কুঞ্চিত ভ্রূ প্রসারিত হইল, তখন সে বসিয়া পড়িল, কহিল, "বটে! যুবরাজ তোমারই বটে! যুবরাজের বিপদ হইয়াছে বলিয়া তোমার গায়ে বড়ো লাগিয়াছে– যেন যুবরাজ আমার কেহ নয়।

পোড়ারমুখো, এটা জানিস না যে সে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভালো করিতে পারি আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস। দেখিব কেমন তাহা পারিস।”

সীতারাম সেই দিনই রায়গড়ে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা বসন্ত রায় রায়গড়ের প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পরপারে একটি আম্রবনের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছেন। বসন্ত রায়ের হাতে তাঁহার চিরসহচর সেতারটি আর নাই। বৃদ্ধ সেই অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন–

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি
আমার ব'লে ছিল যারা
আর তো তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা, কোথায় তারা? কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।
বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে,
আমার কিছু রাখলি নে রে?
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

কে জানে কী ভাবিয়া বৃদ্ধ এই গান গাহিতেছিলেন। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, “গান গাহিতেছি, কিন্তু যাহাদের গান শুনাইতাম, তাহারা যে নাই। গান আপনি আসে, কিন্তু গান গাহিয়া যে আর সুখ নাই। এখনো আনন্দ ভুলি নাই, কিন্তু যখনই আনন্দ জন্মিত, তখনই যাহাদের আলিঙ্গন করিতে সাধ যাইত, তাহারা কোথায়? যেদিন প্রভাতে রায়গড়ে ওই তালগাছটার উপরে মেঘ করিত, মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত সেই দিনই আমি যাহাদের

দেখিতে যশোরে যাত্রা করিতাম, তাহাদের কি আর দেখিতে পাইব না? এখনো এক-একবার মনটা তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠে কিন্তু হায়–”

এই সব বুঝি ভাবিয়া আজ বিকালবেলায় অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের মুখে আপনা-আপনি গান উঠিতেছে– আমিই শুধু রইনু বাকি।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্ত রায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, “খাঁ সাহেব, এসো এসো।” অধিকতর নিকটে গিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, “সাহেব, তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? মেজাজ ভালো আছে তো?”

খাঁ সাহেব। “মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ। আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে আর সুখ নাই। একটি বয়েত আছে– রাত্রি বলে আমি কেহই নই, আমি যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ, তাহারই সহিত আমি একত্রে হাসি, একত্রে ম্লান হইয়া যাই!– মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কী? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব।”

বসন্ত রায় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “সে কী কথা সাহেব? আমার তো অসুখ কিছুই নাই, আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি, নিজের আনন্দে নিজে থাকি, আমার অসুখ কী খাঁ সাহেব?”

খাঁ সাহেব। “মহারাজ এখন আপনার আর তেমন গান বাদ্য শুনা যায় না।” বসন্ত রায় সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “আমার গান শুনিবে সাহেব?

আমি শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে,
রইল যা তা কেবল ফাঁকি।”

খাঁ সাহেব। "আপনি আর সে সেতার বাজান কই? আপনার সে সেতার কোথায়?"

বসন্ত রায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে সেতার যে নাই, তাহা নয়। সেতার আছে শুধু তাহার তার ছিঁড়িয়া গেছে, তাহাতে আর সুর মেলে না।" বলিয়া আম্রবনের দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, একটা গান গাও না– একটা গান গাও; গাও, তাজবে তাজ নওবে নও।"

খাঁ সাহেব গান ধরিলেন,

তাজবে তাজ নওবে নও।

দেখিতে দেখিতে বসন্ত রায় মাতিয়া উঠিলেন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একত্রে গাহিতে লাগিলেন– তাজবে তাজ নওবে নও। ঘন ঘন তাল দিতে লাগিলেন এবং বারবার করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালেরা বাড়িমুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল। এমন সময়ে আসিয়া সীতারাম "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া প্রণাম করিল। বসন্ত রায় একেবারে চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "আরে সীতারাম যে! ভালো আছিস তো? দাদা কেমন আছে? দিদি কোথায়? খবর ভালো তো?"

খাঁ সাহেব চলিয়া গেল। সীতারাম কহিল, "একে একে নিবেদন করিতেছি মহারাজ।" বলিয়া একে একে যুবরাজের কারারোধের কথা কহিল। সীতারাম আগাগোড়া সত্য কথা বলে নাই। যে-কারণে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটিয়াছিল, সে-কারণটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলে নাই।

বসন্ত রায়ের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি সীতারামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। তাঁহার ভ্রূ ঊর্ধ্বে উঠিল, তাঁহার চক্ষু প্রসারিত হইয়া গেল, তাঁহার অধরৌষ্ঠ বিভিন্ন হইয়া গেল– নির্নিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসন্ত রায় কহিলেন, "সীতারাম!"

সীতারাম। "মহারাজ।"

বসন্ত রায়। "তাহা হইলে দাদা এখন কোথায়?"

সীতারাম। "আজ্ঞা, তিনি কারাগারে।"

বসন্ত রায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য কারাগারে, এ-কথাটা বুঝি তাঁহার মাথায় ভালো করিয়া বসিতেছে না, কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আবার কিছুক্ষণ বাদে সীতারামের হাত ধরিয়া কহিলেন, "সীতারাম!"

সীতারাম। "আজ্ঞা মহারাজ।"

বসন্ত রায়। "তাহা হইলে দাদা এখন কী করিতেছে?"

সীতারাম। "কী আর করিবেন। তিনি কারাগারেই আছেন।"

বসন্ত রায়। "তাহাকে কি সকলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে?"

সীতারাম। "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায়। "তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না?"

সীতারাম। "আজ্ঞা না।"

বসন্ত রায়। "সে একলা কারাগারে বসিয়া আছে?"

বসন্ত রায় এ-কথাগুলি বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই– আপনা-আপনি বলিতেছিলেন। সীতারাম তাহা বুঝিতে পারে নাই– সে উত্তর করিল, "হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “দাদা, তুই আমার কাছে আয় রে, তোকে কেহ চিনিল না।”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় তাহার পরদিনই যশোহরে যাত্রা করিলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না। যশোহরে পৌঁছিয়াই একেবারে রাজবাটীর অন্তঃপুরে গেলেন। বিভা সহসা তাহার দাদামহাশয়কে দেখিয়া যেন কী হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কী যে করিবে কিছু যেন ভাবিয়া পাইল না। কেবল চোখে বিস্ময়, অধরে আনন্দ, মুখে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ– খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় লইল। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে পর বসন্ত রায় একবার নিতান্ত একাগ্রদৃষ্টে বিভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" আর কিছু বলিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" যেন তাঁহার মনে একটি অতি ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল যে, সীতারাম যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য না হইতেও পারে। সমস্তটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে পাছে বিভা তাহার উত্তর দিয়া ফেলে। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে বিভা তৎক্ষণাৎ তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই তিনি অতি ভয়ে ভয়ে বিভার মুখখানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" তাই তিনি অতি একাগ্রদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিভা বুঝিল এবং বিভা উত্তর দিতেও পারিল না; তাহার প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুরাইয়া গেছে। আগে যখন দাদামহাশয় আসিতেন, সেইসব দিন তাহার মনে পড়িয়াছে। সে এক কী উৎসবের দিনই গিয়াছে। তিনি আসিলে কী একটা আনন্দই পড়িত। সুরমা হাসিয়া তামাশা করিত, বিভা হাসিত কিন্তু তামাশা করিতে পারিত না, দাদা প্রশান্ত আনন্দমূর্তিতে দাদামহাশয়ের গান শুনিতেন। আজ দাদামহাশয় আসিলেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার কাছে আসিল না, কেবল এই আঁধার সংসারে একলা বিভা– সুখের সংসারের একমাত্র

ভগ্নাবশেষের মতো একলা দাদামহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাদামহাশয় আসিলে যে-ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিত– সেই সুরমার ঘর আজ এমন কেন? সে আজ স্তব্ধ, অন্ধকার, শূন্যময়– দাদামহাশয়কে দেখিলেই সে- ঘরটা যেন এখনই কাঁদিয়া উঠিবে। বসন্ত রায় একবার কী যেন কিসের আশ্বাসে সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন– দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে মাথা লইয়া একবার চারিদিকে দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া বুকফাটা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, ঘরে কি কেহই নাই?"

বিভা কাঁদিয়া কহিল, "না দাদামহাশয়, কেহই নাই।"

স্তব্ধ ঘরটা যেন হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল, "আগে যাহারা ছিল তাহারা কেহই নাই।"

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে বিভার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাহিয়া উঠিলেন,

আমি শুধু রইনু বাকি।

বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও– সে তোমার কী করিয়াছে? তাহাকে যদি তোমরা ভালো না বাস, পদে পদেই যদি সে তোমার কাছে অপরাধ করে তবে তাহাকে এই বুড়োর কাছে দাও না। আমি তাহাকে লইয়া যাই– আমি তাহাকে রাখিয়া দিই। তাহাকে আর তোমাকে দেখিতে হইবে না– সে আমার কাছে থাকিবে!"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া চুপ করিয়া বসন্ত রায়ের কথা শুনিলেন, অবশেষে বলিলেন, "খুড়ামহাশয়, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি, এ-বিষয়ে আপনি অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক অল্প জানেন– অথচ আপনি পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আপনার এ-সকল কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না।"

তখন বসন্ত রায় উঠিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, মনে কি নাই! তোকে যে আমি ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম, সে কি আর মনে পড়ে না? স্বর্গীয় দাদা যেদিন তোকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেদিন হইতে আমি কি এক মুহূর্তের জন্য তোকে কষ্ট দিয়াছি? অসহায় অবস্থায় যখন তুই আমার হাতে ছিলি, একদিনও কি তুই আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলি? প্রতাপ, বল্ দেখি, আমি তোর কী অপরাধ করিয়াছিলাম যাহাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুই আমাকে এত কষ্ট দিতে পারিলি? এমন কথা আমি বলি না যে, তোকে পালন করিয়াছিলাম বলিয়া তুই আমার কাছে ঋণী– তোদের মানুষ করিয়া আমিই আমার দাদার স্নেহ-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতএব প্রতাপ, আমি প্রাপ্য বলিয়া তোর কাছে কিছুই চাহি না, কখনো চাহিও নাই, আমি কেবল তোর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি– তাও দিবি না?"

বসন্ত রায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। বসন্ত রায় আবার কহিলেন, "তবে আমার কথা শুনিবি না, আমার ভিক্ষা রাখিবি না? কথায় উত্তর দিবি নে প্রতাপ?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, একবার আমি উদয়কে দেখিতে চাই। আমাকে তাহার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিতে কেহ যেন নিষেধ না করে এই অনুমতি দাও।"

প্রতাপাদিত্য তাহাও দিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে উদয়াদিত্যের প্রতি এতখানি স্নেহ প্রকাশ করাতে প্রতাপাদিত্য মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যতই মনে হয় লোকে তাঁহাকেই অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, ততই তিনি আরও বাঁকিয়া দাঁড়ান।

বসন্ত রায় নিতান্ত ম্লানমুখে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া বিভার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বিভা দাদামহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, আমার ঘরে এস।"

বসন্ত রায় নীরবে বিভার সঙ্গে সঙ্গে বিভার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ঘরে বসিলে পর বিভা তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার পাকা চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, এস, তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।" বসন্ত রায় কহিলেন, "দিদি সে পাকাচুল কি আর আছে? যখন বয়স হয় নাই তখন সে-সব ছিল, তখন তোদের পাকা চুল তুলিতে বলিতাম। আজ আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি, আজ আর আমার পাকা চুল নাই।"

বসন্ত রায় দেখিলেন বিভার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল, তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আয় বিভা আয়; গোটাকতক চুল তুলিয়া দে। তোদের পাকাচুল সরবরাহ করিয়া উঠিতে আর তো আমি পারি না ভাই। বয়স হইতে চলিল, ক্রমেই মাথায় টাক পড়িতে চলিল। এখন আর একটা মাথার অনুসন্ধান কর্‌, আমি জবাব দিলাম।" বলিয়া বসন্ত রায় হাসিতে লাগিলেন।

একজন দাসী আসিয়া বসন্ত রায়কে কহিল, "রানীমা আপনাকে একবার প্রণাম করিতে চান।"

বসন্ত রায় মহিষীর ঘরে গেলেন, বিভা কারাগারে গেল।

মহিষী বসন্ত রায়কে প্রণাম করিলেন। বসন্ত রায় আশীর্বাদ করিলেন, "মা, আয়ুষ্মতী হও।"

মহিষী কহিলেন, "কাকামহাশয়, ও আশীর্বাদ আর করিবেন না। এখন আমার মরণ হইলেই আমি বাঁচি।"

বসন্ত রায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "রাম, রাম। ও-কথা মুখে আনিতে নাই।"

মহিষী কহিলেন, "আর কী বলিব কাকামহাশয়, আমার ঘরকন্নায় যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।"

বসন্ত রায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মহিষী কহিলেন, “বিভার মুখখানি দেখিয়া আমার মুখে আর অন্নজল রুচে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না, কেবল দিনে দিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। তাহাকে লইয়া যে আমি কী করিব কিছু ভাবিয়া পাই না।”

বসন্ত রায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

“এই দেখুন কাকামহাশয়, এক সর্বনেশে চিঠি আসিয়াছে।” বলিয়া এক চিঠি বসন্ত রায়ের হাতে দিলেন।

বসন্ত রায় সে চিঠি পড়িতে না পড়িতে মহিষী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার কিসের সুখ আছে? উদয়– বাছা আমার কিছু জানে না। তাহাকে তো মহারাজ– সে যেন রাজার মতোই হয় নাই, কিন্তু তাহাকে তো আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সে তো আমার আপনার সন্তান বটে। জানি না, বাছা সেখানে কী করিয়া থাকে, একবার আমাকে দেখিতেও দেয় না।” মহিষী আজকাল যে কথাই পাড়েন, উদয়াদিত্যের কথা তাহার মধ্যে এক স্থলে আসিয়া পড়ে। ওই কষ্টটাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন দিনরাত জাগিয়া আছে।

চিঠি পড়িয়া বসন্ত রায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ চিঠি তো কাহাকেও দেখাও নি মা!”

মহিষী কহিলেন, “মহারাজ এ চিঠির কথা শুনিলে কি আর রক্ষা রাখিবেন, বিভাও কি তাহা হইলে আর বাঁচিবে।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “ভালো করিয়াছ। এ চিঠি আর কাহাকেও দেখাইয়ো না, বউমা। তুমি বিভাকে শীঘ্র তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দাও। মান-অপমানের কথা ভাবিয়ো না!”

মহিষী কহিলেন, “আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। মান লইয়া আমার কাজ নাই, আমার বিভা সুখী হইলেই হইল। কেবল ভয় হয় পাছে বিভাকে তাহারা অযত্ন করে।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “বিভাকে অযত্ন করিবে! বিভা কি অযত্নের ধন। বিভা যেখানে যাইবে সেইখানেই আদর পাইবে। অমন লক্ষ্মী অমন সোনার প্রতিমা আর কোথায় আছে। রামচন্দ্র কেবল তোমাদের উপর রাগ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছে, আবার পাঠাইয়া দিলেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।” বসন্ত রায় তাঁহার সরল হৃদয়ে সরল বুদ্ধিতে এই বুঝিলেন। মহিষীও তাহাই বুঝিলেন।

বসন্ত রায় কহিলেন, “বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া যাও যে, বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র এক চিঠি লিখিয়াছে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে আর অমত করিবে না।”

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বসন্ত রায় একাকী বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সীতারাম তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল।

বসন্ত রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী সীতারাম, কী খবর?"

সীতারাম কহিল, "সে পরে বলিব, আপনাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "কেন, কোথায় সীতারাম?"

সীতারাম তখন কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি ফিস ফিস করিয়া কী বলিল। বসন্ত রায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "সত্য নাকি?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় মনে মনে অনেক ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "এখনই যাইতে হইবে নাকি।"

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ।

বসন্ত রায়। একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব না?

সীতারাম। আজ্ঞা না, আর সময় নাই।

বসন্ত রায়। কোথায় যাইতে হইবে?

সীতারাম। আমার সঙ্গে আসুন, আমি লইয়া যাইতেছি।

বসন্ত রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি না কেন?"

সীতারাম। আজ্ঞা না মহারাজ। দেরি হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।

বসন্ত রায়। তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তবে কাজ নাই– কাজ নাই।” উভয়ে চলিলেন।
আবার কিছু দূর গিয়া কহিলেন, “একটু বিলম্ব করিলে কি চলে না।?”
সীতারাম। না মহারাজ, তাহা হইলে বিপদ হইবে।
“দুর্গা বলো” বলিয়া বসন্ত রায় প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন।

বসন্ত রায় যে আসিয়াছেন, তাহা উদয়াদিত্য জানেন না। বিভা তাঁহাকে বলে নাই। কেননা যখন উভয়ের দেখা হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন এ সংবাদ তাঁহার কষ্টের কারণ হইত। সন্ধ্যার পরে বিদায় লইয়া বিভা কারাগার হইতে চলিয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য একটি প্রদীপ লইয়া একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতেছেন। জানালার ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে, দীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, অক্ষর ভালো দেখা যাইতেছে না। কীটপতঙ্গ আসিয়া দীপের উপর পড়িতেছে। এক- এক বার দীপ নিবো-নিবো হইতেছে। একবার বাতাস বেগে আসিল– দীপ নিবিয়া গেল। উদয়াদিত্য পুঁথি ঝাঁপিয়া তাঁহার খাটে গিয়া বসিলেন। একে একে কত কী ভাবনা আসিয়া পড়িল। বিভার কথা মনে আসিল। আজ বিভা কিছু দেরি করিয়া আসিয়াছিল, কিছু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিভাকে কিছু বিশেষ ম্লান দেখিয়াছিলেন; তাহাই লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। পৃথিবীতে যেন তাঁহার আর কেহ নাই। সমস্ত দিন বিভাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পান না। বিভাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। তৃষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্যন্ত যেমন উপভোগ করে, তেমনি বিভার প্রীতির অতি সামান্য চিহ্নটুকু পর্যন্ত তিনি প্রাণ-মনে উপভোগ করেন। আজ তাই এই বিজন ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা শুইয়া স্নেহের প্রতিমা বিভার ম্লান মুখখানি ভাবিতেছিলেন। সেই অন্ধকারে বসিয়া তাঁহার একবার মনে হইল, “বিভার কি ক্রমেই বিরক্তি ধরিতেছে? এই নিরানন্দ

কারাগারের মধ্যে এক বিষণ্ন অন্ধকার মূর্তির সেবা করিতে আর কি তাহার ভালো লাগিতেছে না? আমাকে কি ক্রমেই সে তাহার সুখের বাধা তাহার সংসার-পথের কন্টক বলিয়া দেখিবে? আজ দেরি করিয়া আসিয়াছে, কাল হয়তো আরো দেরি করিয়া আসিবে, তাহার পরে একদিন হয়তো সমস্ত দিন বসিয়া আছি কখন বিভা আসিবে– বিকাল হইল, সন্ধ্যা হইল– রাত্রি হইল, বিভা আর আসিল না।– তাহার পর হইতে আর হয়তো বিভা আসিবে না।" উদয়াদিত্যের মনে যতই এই কথা উদয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনটা হা হা করিতে লাগিল– তাঁহার কল্পনারাজ্যের চারিদিক কী ভয়ানক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। একদিন আসিবে যেদিন বিভা তাঁহাকে স্নেহশূন্য নয়নে তাহার সুখের কন্টক বলিয়া দেখিবে সেই অতিদূর কল্পনার আভাসমাত্র লাগিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিতেছেন, "আমি কী ভয়ানক স্বার্থপর। আমি বিভাকে ভালোবাসি বলিয়া তাহার যে ঘোরতর শত্রুতা করিতেছি, কোনো শত্রুও বোধ করি এমন পারে না।" বার বার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আর বিভার উপর নির্ভর করিবেন না কিন্তু যখনই কল্পনা করিতেন তিনি বিভাকে হারাইয়াছেন, তখনই তাঁহার মনে সে বল চালিয়া যাইতেছে, তখনই তিনি অকূল পাথারে পড়িয়া যাইতেছেন– মরণাপন্ন মজ্জমান ব্যক্তির মতো বিভার কাল্পনিক মূর্তিকে আকুলভাবে আঁকড়িয়া ধরিতেছেন।

এমন সময়ে বহির্দেশে সহসা "আগুন– আগুন" বলিয়া এক ঘোরতর কোলাহল উঠিল। উদয়াদিত্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল, বাহিরে শত শত কণ্ঠরোল একত্রে উঠিল, সহসা নানা কণ্ঠে নানাবিধ চীৎকার সহিত আকাশে শত লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, প্রাসাদের কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিতে লাগিল– তাঁহার মন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা দ্রুতবেগে তাঁহার

কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। কে একজন তাঁহার অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল– তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

সে উত্তর করিল, "আমি সীতারাম, আপনি বাহির হইয়া আসুন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন?"

সীতারাম কহিল, "যুবরাজ, কারাগৃহে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন।" বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া– প্রায় তাঁহাকে বহন করিয়া কারাগারের বাহিরে লইয়া গেল।

অনেকদিনের পর উদয়াদিত্য আজ মুক্ত স্থানে আসিলেন– মাথার উপরে সহসা অনেকটা আকাশ দেখিতে পাইলেন, বাতাস যেন তাহার বিস্তৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চোখের বাধা চারিদিক হইতে খুলিয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রে, আকাশের অসংখ্য তারকার দৃষ্টির নিম্নে, বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোমল তৃণজালের উপর দাঁড়াইয়া সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরিসীম অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সেই আনন্দে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিব, কোথায় যাইব?" অনেকদিন সংকীর্ণ স্থানে বদ্ধ ছিলেন, চলেন ফেরেন নাই– আজ এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া অসহায়ভাবে সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিব? কোথায় যাইব?"

সীতারাম কহিল, "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।"

এদিকে আগুন খুব জ্বলিতেছে। বৈকালে কতকগুলি প্রজা প্রধান কর্মচারীদের নিকট কী একটা নিবেদন করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একত্র বসিয়াছিল, তাহারাই প্রথমে আগুনের গোল তোলে। প্রহরীদের বাসের জন্য কারাগারের কাছে একটি দীর্ঘ কুটিরশ্রেণী ছিল– সেইখানেই তাহাদের চারপাই বাসন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র সমস্তই থাকে। অগ্নির সংবাদ পাইয়াই যত প্রহরী পারিল, সকলেই ছুটিয়া গেল, যাহারা

নিতান্তই পারিল না, তাহারা হাত-পা আছড়াইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের গৃহদ্বারেও দুই-এক জন প্রহরী ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কড়াক্কড় পাহারা দিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দস্তুর ছিল বলিয়া তাহারা পাহারা দিত মাত্র। কারণ উদয়াদিত্য এমন শান্তভাবে তাঁহার গৃহে বসিয়া থাকিতেন যে, বোধ হইত না যে তিনি কখনো পলাইবার চেষ্টা করিবেন বা তাঁহার পলাইবার ইচ্ছা আছে। এইজন্য তাঁহার দ্বারের প্রহরীরা সর্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত হইতে লাগিল, আগুন নেবে না– কেহ বা জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, কেহ বা জল ঢালিতে লাগিল। কেহ বা কিছুই না করিয়া কেবল গোলমাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল; আগুন নিবিলে পর তাহারাই সকলের অপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিল। এইরূপ সকলে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল, সে কী একটা বলিতে চায়। কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? কেহ তাহাকে গালাগালি দিল, কেহ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, কেহই তাহার কথা শুনিল না। যে শুনিল সে কহিল, “যুবরাজ পলাইলেন তাতে আমার কী মাগী, তোরই বা কী? সে দয়াল সিং জানে। আমার ঘর ফেলিয়া এখন আমি কোথাও যাইতে পারি না।” বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ বার বার প্রতিহত হইয়া সেই রমণী অতি প্রচণ্ডা হইয়া উঠিল। একজন যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই সবলে ধরিয়া কহিল, “পোড়ামুখো, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরি কর সে জ্ঞান কি নাই? কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোয় কাঁটা দিয়া তোমাদের মাটিতে পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবরাজ যে পলাইয়া গেল।”

“ভালোই হইয়াছে, তোর তাহাতে কী?” বলিয়া তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিল। যাহারা ঘরে আগুন লাগাইয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন। প্রহার খাইয়া সেই রমণীর মূর্তি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো তাহার চোখ দুটো জ্বলিতে লাগিল,

তাহার চুলগুলা ফুলিয়া উঠিল; সে দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিতে লাগিল, তাহার সেই মুখের উপর বহ্নিশিখার আভা পড়িয়া তাহার মুখ পিশাচীর মতো দেখিতে হইল। সম্মুখে একটি কাষ্ঠখণ্ড জ্বলিতেছিল, সেইটি তুলিয়া লইল, হাত পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা ফেলিল না, সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিছুতে ধরিতে না পারিয়া সেই কাষ্ঠ তাহার প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া খালের ধারে লইয়া গেল। সেখানে একখানা বড়ো নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকার সম্মুখে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া নৌকা হইতে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "দাদা আসিয়াছিস?" উদয়াদিত্য একেবারে চমকিয়া উঠিলেন– সেই চিরপরিচিত স্বর, যে স্বর বাল্যের স্মৃতির সহিত, যৌবনের সুখদুঃখের সহিত জড়িত, পৃথিবীতে যতটুকু সুখ কাছে, যতটুকু আনন্দ আছে যে স্বর তাহারই সহিত অবিচ্ছিন্ন। এক-একদিন কারাগারে গভীর রাত্রে বিনিদ্রনয়নে বসিয়া সহসা স্বপ্নে বংশীধ্বনির ন্যায় যে স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন– সেই স্বর। বিস্ময় ভাঙিতে না ভাঙিতে বসন্ত রায় আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের দুই চক্ষু বাষ্পে পুরিয়া গেল। উভয়ে সেইখানে তৃণের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়।" বসন্ত রায় কহিলেন, "কী দাদা।" আর কিছু কথা হইল না। আবার অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া, বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন, "দাদামহাশয়, আজ আমি স্বাধীনতা পাইয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি, আমার আর সুখের কী অবশিষ্ট আছে? এ মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকিবে?" কিয়ৎক্ষণ পরে সীতারাম জোড়হাত করিয়া কহিল, "যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।"

যুবরাজ চমক ভাঙিয়া কহিলেন, "কেন, নৌকায় কেন?"

সীতারাম কহিল, "নহিলে এখনই আবার প্রহরীরা আসিবে।"

উদয়াদিত্য বিস্মিত হইয়া বসন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, আমরা কি পলাইয়া যাইতেছি?"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। এ যে পাষাণ-হৃদয়ের দেশ– এরা যে তোকে ভালোবাসে না। তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস, আমি তোকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে নিরাপদে থাকিবি।" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন যেন তাঁহাকে কঠোর সংসার হইতে কাড়িয়া আনিয়া স্নেহের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান।

উদয়াদিত্য অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "না দাদামহাশয়, আমি পলাইতে পারিব না।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "কেন দাদা, এ বুড়াকে কি ভুলিয়া গেছিস।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি যাই– একবার পিতার পা ধরিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাই গে, তিনি হয়তো রায়গড়ে যাইতে সম্মতি দিবেন।"

বসন্ত রায় অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার কথা শোন্– সেখানে যাস নে, সে-চেষ্টা করা নিষ্ফল।"

উদয়াদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তবে যাই। আমি কারাগারে ফিরিয়া যাই।"

বসন্ত রায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কেমন যাইবি যা দেখি। আমি যাইতে দিব না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়, এ-হতভাগ্যকে লইয়া কেন বিপদকে ডাকিতেছ। আমি যেখানে থাকি সেখানে কি তিলেক শান্তির সম্ভাবনা আছে?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। এই তাহার নবীন বয়সে সেকি তাহার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দিবে?" বসন্ত রায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তখন উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তবে চলো চলো দাদামহাশয়।" সীতারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাইতে চাই।"

সীতারাম কহিল, "নৌকাতেই কাগজ-কলম আছে, আনিয়া দিতেছি। শীঘ্র করিয়া লিখিবেন, অধিক সময় নাই।"

উদয়াদিত্য পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। মাতাকে লিখিলেন, "মা, আমাকে গর্ভে ধরিয়া তুমি কখনো সুখী হইতে পার নাই। এইবার নিশ্চিন্ত হও মা– আমি দাদামহাশয়ের কাছে যাইতেছি, সেখানে আমি সুখে থাকিব, স্নেহে থাকিব, তোমার কোনো ভাবনার কারণ থাকিবে না।" বিভাকে লিখিলেন, "চিরায়ুষ্মতীষু– তোমাকে আর কী লিখিব– তুমি জন্ম জন্ম সুখে থাকো– স্বামিগৃহে গিয়া সুখের সংসার পাতিয়া সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাও।" লিখিতে লিখিতে উদয়াদিত্যের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সীতারাম সেই চিঠি তিনখানি একজন দাঁড়ির হাত দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। সকলে নৌকাতে উঠিতেছেন– এমন সময়ে দেখিলেন, কে একজন ছুটিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে। সীতারাম চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই রে– সেই ডাকনী আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে রুক্মিণী কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চুল এলোথেলো, তাহার অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জলন্ত অঙ্গারের মতো চোখ দুটা অগ্নি উদ্‌গার করিতেছে– তাহার বার বার প্রতিহত বাসনা, অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে যেন যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রোষ মিটাইতে চায়। যেখানে প্রহরীরা আগুন নিবাইতেছিল, সেখানে বার বার ধাক্কা খাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পাগলের মতো প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে– একেবারে প্রতাপাদিত্যের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করে, প্রহরীরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে।

বাঘিনীর মতো সে উদয়াদিত্যের উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সীতারাম মাঝে আসিয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া সে সীতারামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, প্রাণপণে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল– সহসা সীতারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ি মাঝিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলপূর্বক রুক্মিণীকে ছাড়াইয়া লইল। আত্মঘাতী বৃশ্চিক যেমন নিজের সর্বাঙ্গে হুল ফুটাইতে থাকে, তেমনই সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "কিছুই হইল না, কিছুই হইল না– এই আমি মরিলাম, এ স্ত্রীহত্যার পাপ তোদের হইবে।" সেই অন্ধকার রাত্রে এই অভিশাপ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুদ্বেগে রুক্মিণী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বর্ষায় খালের জল অত্যন্ত বাড়িয়াছিল– কোথায় সে তলাইয়া গেল ঠিকানা রহিল না। সীতারামের কাঁধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল, চাদর জলে ভিজাইয়া কাঁধে বাঁধিল। নিকটে গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্যের কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছে, তাঁহার হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন– বসন্ত রায়ও যেন দিশাহারা হইয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দাঁড়িগণ উভয়কে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল। সীতারাম ভীত হইয়া কহিল, "যাত্রার সময় কী অমঙ্গল।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যের নৌকা খাল অতিক্রম করিয়া নদীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন সীতারাম নৌকা হইতে নামিয়া শহরে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় যুবরাজের নিকট হইতে তাঁহার তলোয়ারটি চাহিয়া লইল।

উদয়াদিত্যের তিনখানি পত্র একটি লোকের হাত দিয়া সীতারাম প্রাসাদে প্রেরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চিঠি কয়খানি কাহারও হাতে দিতে তাহাকে গোপনে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিল। নৌকা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সেই চিঠি কয়খানি ফিরাইয়া লইল। কেবল মহিষী ও বিভার চিঠিখানি রাখিয়া বাকি পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।

তখন আগুন আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। তাহাতে নির্বাণের ব্যাঘাত হইতেছে বই সুবিধা হইতেছে না।

এই অগ্নিকাণ্ডে যে সীতারামের হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত কয়েকজন প্রজা ও প্রাসাদের ভৃত্যের সাহায্যে সে-ই এই কীর্তি করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একেবারে পাঁচ-ছয়টা ঘরে যে বিনা কারণে আগুন ধরিয়া উঠিল, ইহা কখনো দৈবের কর্ম নহে, এতক্ষণ এত চেষ্টা করিয়া আগুন নিবিয়াও যে নিবিতেছে না, তাহারও কারণ আছে। যাহারা আগুন নিবাইতে যোগ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই দুই-একজন করিয়া সীতারামের লোক আছে। যেখানে আগুন নাই তাহারা সেইখানে জল ঢালে, জল আনিতে

গিয়া আনে না, কৌশলে কলসী ভাঙিয়া ফেলে, গোলমাল করিয়া এ ওর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়ে। আগুন আর নেবে না।

এদিকে যখন এইরূপ গোলযোগ চলিতেছে, তখন সীতারামের দলস্থ লোকেরা উদয়াদিত্যের শূন্য কারাগারে আগুন লাগাইয়া দিল। একে একে জানালা দরজা কড়ি-বরগা চৌকাঠ কাঠের বেড়া প্রভৃতিতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই কারাগৃহে যে কোনো সূত্রে আগুন ধরিতে পারে, ইহা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর, সুতরাং সেদিকে আর কাহারও মনোযোগ পড়ে নাই। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আগুন বেশ রীতিমতো ধরিয়াছে। কতকগুলা হাড়, মড়ার মাথা ও উদয়াদিত্যের তলোয়ারটি সীতারাম কোনো প্রকারে উদয়াদিত্যের সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এদিকে যাহারা প্রহরীশালার আগুন নিবাইতেছিল, কারাগারের দিক হইতে সহসা তাহারা এক চীৎকার শুনিতে পাইল। সকলে চমকিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “ও কী রে।” একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “ওরে, যুবরাজের ঘরে আগুন ধরিয়াছে।” প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল, জিনিসপত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে আর একজন সেই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “কারাগৃহের মধ্য হইতে যুবরাজ চীৎকার করিতেছেন শুনা গেল।” তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সীতারাম ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “ওরে তোরা শীঘ্র আয়। যুবরাজের ঘরের ছাদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর তো তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।” যুবরাজের কারাগৃহের দিকে সকলে ছুটিল। গিয়া দেখিল গৃহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে– চারিদিকে আগুন– ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কাহার অসাবধানতায় এই ঘটনাটি ঘটিল,

সকলেই তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল। এমন কি, মারামারি হইবার উপক্রম হইল।

সীতারাম ভাবিল, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। যখন সে দেখিল, ঘরে বেশ করিয়া আগুন লাগিয়াছে, তখন সে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আনন্দমনে তাহার কুটিরাভিমুখে চলিল। প্রাসাদ হইতে অনেক দূরে আসিল। তখন রাত্রি অনেক, পথে লোক নাই, চারিদিক স্তব্ধ। বাঁশ গাছের পাতা ঝর ঝর করিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিনা বাতাস বহিতেছে, সীতারামের শৌখিন প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটি রসগর্ভ গান ধরিয়াছে। সেই জনশূন্য স্তব্ধ পথ দিয়া একাকী পান্থ মনের উল্লাসে গান গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া তাহার মনের মধ্যে এক ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যশোহর হইতে তো সপরিবারে পলাইতেই হইবে, অমনি বিনা মেহনতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক না। মঙ্গলা পোড়ামুখী তো মরিয়াছে, বালাই গিয়াছে, একবার তাহার বাড়ি হইয়া যাওয়া যাক। বেটির টাকা আছে ঢের, তাহার ত্রিসংসারে কেহই নাই, সে-টাকা আমি না লই তো আর-একজন লইবে– তায় কাজ কী, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া সীতারাম রুক্মিণীর বাড়ির মুখে চলিল, প্রফুল্লমনে আবার গান ধরিল। যাইতে যাইতে পথে একজন অভিসারিণীকে দেখিতে পাইল। সীতারামের নজরে এ সকল কিছুতেই এড়াইতে পায় না। দুইটা রসিকতা করিবার জন্য তাহার মনে অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হইল– কিন্তু সময় নাই দেখিয়া সে আবেগ দমন করিয়া হন হন করিয়া চলিল।

সীতারাম রুক্মিণীর কুটিরের নিকটে গিয়া দেখিল, দ্বার খোলাই আছে। হৃষ্টচিত্তে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ কহিল। ঘোরতর অন্ধকার– কিছুই দেখা যাইতেছে না। একবার চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিল। একটা সিন্দুকের উপর হুঁচট খাইয়া

পড়িয়া গেল, দুই-একবার দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। সীতারামের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন ঘরে আছে। কাহার যেন নিশ্বাসপ্রশ্বাস শুনা যাইতেছে– আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, রুক্মিণীর শয়নগৃহ হইতে আলো আসিতেছে। প্রদীপটা এখনো জ্বলিতেছে মনে করিয়া সীতারামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে গেল। ও কে ও! ঘরে বসিয়া কে! বিনিদ্রনয়নে চুপ করিয়া বসিয়া কে ও রমণী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অর্ধাবৃত দেহে ভিজা কাপড় জড়ানো, এলোচুল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দাঁত ঠক্ ঠক্ করিতেছে। ঘরে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলো তাহার পাংশুবর্ণ মুখের উপর পড়িতেছে, পশ্চাতে সেই রমণীর অতি বৃহৎ এক ছায়া দেয়ালের উপর পড়িয়াছে– ঘরে আর কিছু নাই– কেবল সেই পাংশু মুখশ্রী, সেই দীর্ঘ ছায়া আর এক ভীষণ নিস্তব্ধতা। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সীতারামের শরীর হিম হইয়া গেল। দেখিল ক্ষীণ আলোকে, এলোচুলে, ভিজা কাপড়ে সেই মঙ্গলা বসিয়া আছে। সহসা দেখিয়া তাহাকে প্রেতিনী বলিয়া বোধ হইল। অগ্রসর হইতেও সীতারামের সাহস হইল না– ভরসা বাঁধিয়া পিছন ফিরিতেও পারিল না। সীতারাম নিতান্ত ভীরু ছিল না, অল্পক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বাহ্যিক সাহস ও মৌখিক উপহাসের স্বরে কহিল, "তুই কোথা হইতে মাগী। তোর মরণ নাই নাকি।" রুক্মিণী কট্মট্ করিয়া খানিকক্ষণ সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল– তখন সীতারামের প্রাণটা তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল, "বটে। তোদের এখনও সর্বনাশ হইল না, আর আমি মরিব!" উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, "যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আগে তোকে আর যুবরাজকে

চুলায় শুয়াইব, তোদের চুলা হইতে দু মুঠা ছাই লইয়া গায়ে মাখিয়া দেহ সার্থক করিব– তার পরে যমের সাধ মিটাইব। তাহার আগে যমালয়ে আমার ঠাঁই নাই।"

রুক্মিণীর গলা শুনিয়া সীতারামের অত্যন্ত সাহস হইল। সে সহসা অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া রুক্মিণীর সহিত ভাব করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুব যে কাছে ঘেঁষিয়া গেল তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া কোমল স্বরে কহিল, "মাইরি ভাই, ওইজন্যই তো রাগ ধরে। তোমার কখন যে কী মতি হয়, ভালো বুঝতে পারি না। বল্ তো মঙ্গলা, আমি তোর কী করেছি। অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন? মান করেছিস বুঝি ভাই? সেই গানটা গাব?"

সীতারাম যতই অনুরাগের ভান করিতে লাগিল, রুক্মিণী ততই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিতে লাগিল– সীতারাম যদি তাহার নিজের মাথার চুল হইত, তবে তাহা দুই হাতে পট্‌পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত। সীতারাম যদি তাহার নিজের চোখ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা নখ দিয়া উপড়াইয়া পা দিয়া দলিয়া ফেলিতে পারিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কিছুই হাতের কাছে পাইল না। দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া কহিল, "একটু রোসো; তোমার মুণ্ডপাত করিতেছি।" বলিয়া থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বঁটির অন্বেষণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ হইল– সীতারাম গলায় চাদর বাঁধিয়া রূপক অলংকারে মরিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর চেহারা দেখিয়া তাহার রূপক ঘুরিয়া গেল এবং চৈতন্য হইল যে সত্যকার বঁটির আঘাতে মরিতে এখনো সে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এই নিমিত্ত অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুটিরের বাহিরে সরিয়া পড়িল। রুক্মিণী বঁটিহস্তে শূন্যগৃহে আসিয়া ঘরের মেজেতে সীতারামের উদ্দেশে বার বার আঘাত করিল।

রুক্মিণী এখন মরিয়া হইয়াছে। যুবরাজের আচরণে তাহার দুরাশা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে– তাহার সমস্ত উপায় সমস্ত উদ্দেশ্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন রুক্মিণীর আর সেই তীক্ষ্ণশাণিত হাস্য নাই, বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ নাই, তাহার সেই ভাদ্র মাসের জাহ্নবীর ঢলঢল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই– রাজবাটীর যে-সকল ভৃত্যেরা তাহার কাছে আসিত, তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। দেওয়ানজির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সেদিন পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সহিত রসিকতা করিতে আসিয়াছিল, রুক্মিণী তাহাকে ঝাঁটাইয়া তাড়াইয়াছে। এখন আর কেহ তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করে।

সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিল, মঙ্গলা যুবরাজের পলায়ন-বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছে; অতএব ইহার দ্বারাই সব ফাঁস হইবে। সর্বনাশীকে গলা টিপিয়া মারিয়া আসিলাম না কেন। যাহা হউক, আমার আর যশোহরে একমুহূর্ত থাকা শ্রেয় নয়। আমি এখনই পালাই। সেই রাত্রেই সীতারাম সপরিবারে যশোহর ছাড়িয়া রায়গড়ে পলাইল।

শেষরাত্রে মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আগুনও ক্রমে নিবিয়া গেল, যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতাপাদিত্য বহির্দেশে তাঁহার সভাভবনে আসিয়া বসিলেন। প্রহরীদের ডাকাইয়া আনিলেন, মন্ত্রী আসিল, আর দুই-একজন সভাসদ আসিল। একজন সাক্ষ্য দিল, যখন আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন সে যুবরাজকে জানালার মধ্য হইতে দেখিয়াছে। আর-কয়েকজন কহিল, তাহারা যুবরাজের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। আর-একজন যুবরাজের গৃহ হইতে তাঁহার গলিত দগ্ধ তলোয়ারের অবশিষ্টাংশ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “খুড়া কোথায়?” রাজবাটী অনুসন্ধান করিয়া

তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কেহ কহিল, "যখন আগুন লাগিয়াছিল, তখন তিনিও কারাগারে ছিলেন।" কেহ কহিল, "না, রাত্রেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে ও তাহা শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যশোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" প্রতাপাদিত্য এইরূপ যখন সভায় বসিয়া সকলের সাক্ষ্য শুনিতেছেন, এমন সময়ে গৃহদ্বারে এক কলরব উঠিল। একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে নিষেধ করিতেছে। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাহাকে ঘরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। একজন প্রহরী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কী চাও?" সে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমি আর কিছু চাই না– তোমার ওই প্রহরীদিগকে, সকলকে একে একে ছয় মাস গারদে পচাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াও, এই আমি দেখিতে চাই। ওরা কি তোমাকে মানে, না তোমাকে ভয় করে!" এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা চারিদিক হইতে গোল করিয়া উঠিল। রুক্মিণী পিছন ফিরিয়া চোখ পাকাইয়া তীব্র এক ধমক দিয়া কহিল, "চুপ কর মিন্‌সেরা। কাল যখন তোদের হাতে-পায়ে ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম, ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমদের রায়গড়ের বুড়া রাজার সঙ্গে পালায়, তখন যে তোরা পোড়ারমুখোরা আমার কথায় কান দিলি নে? রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে, তোমারা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ! পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত বলো।"

রুক্মিণী কহিল, "বলিব আর কী। তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড়া রাজার সঙ্গে পলাইয়াছে!"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে কে আগুন দিয়াছে জান?"

রুক্মিণী কহিল, "আমি আর জানি না! সেই যে তোমাদের সীতারাম। তোমাদের যুবরাজের সঙ্গে যে তার বড়ো পিরিত, আর কেউ যেন তাঁর কেউ নয় সীতারামই যেন তাঁর সব। এ-সমস্ত সেই সীতারামের কাজ। বুড়া রাজা, সীতারাম আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ইহা করিয়াছে, এই তোমাকে স্পষ্ট বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ-সব কী করিয়া জানিতে পারিলে?" রুক্মিণী কহিল, "সে-কথায় কাজ কী গা! আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব। তোমার রাজবাড়ির চাকররা সব ভেড়া, উহারা এ-কাজ করিবে না।"

প্রতাপাদিত্য রুক্মিণীর সহিত লোক দিতে আদেশ করিলেন ও প্রহরীদিগের প্রতি যথাবিহিত শাস্তির বিধান করিলেন। একে একে সভাগৃহ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রী ও মহারাজ অবশিষ্ট রহিলেন। মন্ত্রী মনে করিলেন, মহারাজ অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী একবার কী বলিবার অভিপ্রায়ে অতি ধীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ।" মহারাজ তাহার কোনো উত্তর করিলেন না। মন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্বে প্রতাপাদিত্য একজন জেলের মুখে উদয়াদিত্যের পলায়ন- সংবাদ পাইলেন। নৌকা করিয়া নদী বাহিয়া উদয়াদিত্য চলিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নানা লোকের মুখ হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলেন। রুক্মিণীর সহিত যে লোকেরা গিয়াছিল তাহারা এক সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যুবরাজকে রায়গড়ে দেখিয়া আসিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়?" তাহারা কহিল, "সে আর ফিরিয়া আসিল না, সে সেইখানেই রহিল।"

তখন প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ার খাঁ নামক তাঁহার এক পাঠান সেনাপতিকে ডাকিয়া তাহার প্রতি গোপনে কী একটা আদেশ করিলেন। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্যের পূর্বেই মহিষী ও বিভা উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। উভয়েই ভয়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছিলেন যে, মহারাজ যখন জানিতে পারিবেন, তখন না জানি কী করিবেন। প্রতিদিন মহারাজ যখন এক-একটি করিয়া সংবাদ পাইতেছিলেন, আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে সপ্তাহ গেল, অবশেষে মহারাজ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ক্রোধের আভাসমাত্র প্রকাশ করিলেন না। মহিষী আর সংশয়ে থাকিতে না পারিয়া একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ উদয়াদিত্য সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজও সে-বিষয়ে কোনো কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মহিষী বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা রাখো, এবার উদয়কে মাপ করো। বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্তিভাবে কহিলেন, "আগে হইতে যে তুমি কাঁদিতে বসিলে! আমি তো কিছুই করি নাই।"

পাছে প্রতাপাদিত্য আবার সহসা বাঁকিয়া দাঁড়ান এই নিমিত্ত মহিষী ও-কথা আর দ্বিতীয় বার উত্থাপিত করিতে সাহস করিলেন না। ভীত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, মহারাজের কোনো প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। তাহাই দেখিয়া মহিষী ও বিভা আশ্বস্তা হইলেন। মনে করিলেন, উদয়াদিত্য স্থানান্তরে যাওয়ায় মহারাজ মনে মনে বুঝি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এখন কিছুদিনের জন্য মহিষী একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

ইতিপূর্বেই মহিষী বিভাকে বলিয়াছেন ও বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র রায় এক পত্র লিখিয়াছেন। বিভার মনে আর আহ্লাদ ধরে না। রামমোহনকে বিদায় করিয়া অবধি বিভার মনে আর এক মুহূর্তের জন্য শান্তি ছিল না। যখনই সে অবসর পাইত তখনই ভাবিত "তিনি কী মনে করিতেছেন? তিনি কি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? হয়তো তিনি রাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আমাকে কি মাপ করিবেন না? হা জগদীশ্বর, বুঝাইয়া বলিব কবে? কবে আবার দেখা হইবে?' উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বিভা ক্রমাগত এই কথাই ভাবিত। দিবানিশি তাহার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাপিয়া ছিল। মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কী অপরিসীম আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কী ভয়ানক একটা গুরুভার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। লজ্জা-শরম দূর করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সে তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। বিভা যখন মনে করিল তাহার স্বামী তাহাকে ভুল বুঝেন নাই, তাহার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছেন– তখন তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিল। তাহার স্বামীর হৃদয়কে কী প্রশস্ত বলিয়াই মনে হইল! তাহার স্বামীর ভালোবাসার উপর কতখানি বিশ্বাস, কতখানি আস্থা জন্মিল! সে মনে করিল,তাহার স্বামীর ভালোবাসা এ জগতে তাহার অটল আশ্রয়। সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুকুমার লতাটির মতো বাহু জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মতো প্রসারিত, নির্মল হইয়া গেল। সে এখন তাহার ভাই সমরাদিত্যের সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো কত কী খেলা করে। ছোটো স্নেহের মেয়েটির

মতো তাহার মায়ের কাছে কত কী আবদার করে, তাহার মায়ের গৃহকার্যে সাহায্য করে। আগে যে তাহার একটি বাক্যহীন নিস্তব্ধ বিষণ্ন ছায়ার মতো ভাব ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেছে– এখন তাহার প্রফুল্ল হৃদয়খানি পরিস্ফুট প্রভাতের ন্যায় তাহার সর্বাঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মতো সে সংকোচ, সে লজ্জা, সে বিষাদ, সে অভিমান, সেই নীরব ভাব আর নাই; সে এখন আনন্দভরে বিশ্বস্তভাবে মায়ের সহিত এত কথা বলে যে আগে হইলে বলিতে লজ্জা করিত, ইচ্ছাই হইত না। মেয়ের এই আনন্দ দেখিয়া মায়ের অসীম স্নেহ উথলিয়া উঠিল। মনের ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা জাগিতেছে বটে, কিন্তু বিভার নিকট আভাসেও সে ভাবনা কখনো প্রকাশ করেন নাই। মা হইয়া আবার কোন্ প্রাণে বিভার সেই বিমল প্রশান্ত হাসিটুকু এক তিল মলিন করিবেন। এইজন্য মেয়েটি প্রতিদিন চোখের সামনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মা হাস্যমুখে অপরিতৃপ্ত নয়নে তাহাই দেখেন।

মহিষীর মনের ভিতর নাকি একটা ভয়, একটা সন্দেহ বর্তমান ছিল, তারই জন্য আজ কাল করিয়া এ-পর্যন্ত বিভাকে আর প্রাণ ধরিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে পারিতেছেন না। দুই-এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, উদয়াদিত্যের বিষয়ে সকলেই একপ্রকার নিশ্চিত হইয়াছেন। কেবল বিভার সম্বন্ধে যে কী করিবেন, মহিষী এখনো তাহার একটা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন আরো কিছুদিন গেল। যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই বিভার অধীরতা বাড়িতেছে। বিভা মনে করিতেছে, যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই সে যেন তাহার স্বামীর নিকট অপরাধী হইতেছে। তিনি যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আর কিসের জন্য বিলম্ব করা। একবার তিনি মার্জনা করিয়াছেন, আবার–। কয়েক দিন বিভা আর কিছু বলিল না, অবশেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না; মায়ের কাছে গিয়া মায়ের গলা ধরিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভা কহিল, "মা।" ওই কথাতেই তাহার মা

সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, বিভাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “কী বাছা।” বিভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, “মা, তুই আমাকে কবে পাঠাইবি মা।” বলিতে বলিতে বিভার মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। মা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় পাঠাইব বিভু।” বিভা মিনতিস্বরে কহিল, “বলো না মা।” মহিষী কহিলেন, “আর কিছুদিন সবুর করো বাছা। শীঘ্রই পাঠাইব।” বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বহুদিনের পরে উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন, কিন্তু আগেকার মতো তেমন আনন্দ আর পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চাপিয়া ছিল, তাই কিছুই তেমন ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, দাদামহাশয় যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার যে কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই, পিতা যে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন এমন তো বোধ হয় না। আমার কী কুক্ষণেই জন্ম হইয়াছিল। তিনি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া কহিলেন, "দাদামহাশয়, আমি যাই, যশোহরে ফিরিয়া যাই। "প্রথম প্রথম বসন্ত রায় গান গাহিয়া হাসিয়া এ-কথা উড়াইয়া দিলেন; তিনি গাহিলেন,

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম
জোর করে রাখিব ধরে।
শূন্য করে হৃদয়-পুরী প্রাণ যদি করিলে চুরি
তুমিই তবে থাকো সেথায়
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

অবশেষে উদয়াদিত্য বারবার কহিলে পর বসন্ত রায়ের মনে আঘাত লাগিল, তিনি গান বন্ধ করিয়া বিষণ্নমুখে কহিলেন, "কেন দাদা, আমি কাছে থাকিলে তোর কিসের অসুখ?" উদয়াদিত্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উদয়াদিত্যকে উন্মনা দেখিয়া বসন্ত রায় তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য দিনরাত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেতার বাজাইতেন, গান গাহিতেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘুড়িয়া

বেড়াইতেন, উদয়াদিত্যের জন্য প্রায় তাঁহার রাজকার্য বন্ধ হইল। বসন্ত রায়ের ভয় পাছে উদয়াদিত্যকে না রাখিতে পারেন, পাছে উদয়াদিত্য আবার যশোহরে চলিয়া যান। দিনরাত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহাকে বলেন, "দাদা, তোকে আর সে পাষাণহৃদয়ের দেশে যাইতে দিব না।"

দিনকতক থাকিতে থাকিতে উদয়াদিত্যের মনের ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। অনেকদিনের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সংকীর্ণপ্রসর পাষাণময় চারিটি কারাভিত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বসন্ত রায়ের কোমল হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার অসীম স্নেহের মধ্যে বাস করিতেছেন। অনেক দিনের পর চারিদিকে গাছপালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার আলো দেখিতেছেন, পাখির গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্বাঙ্গে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তব্ধতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন। যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আর বাধা নাই। ছেলেবেলা যে-সকল প্রজারা উদয়াদিত্যকে চিনিত, তাহারা দূর-দূরান্তর হইতে উদয়াদিত্যকে দেখিবার জন্য আসিল। গঙ্গাধর আসিল, ফটিক আসিল, হবিচাচা ও করিমউল্লা আসিল, মথুর তাহার তিনটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, পরান ও হরি দুই ভাই আসিল, শীতল সর্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া আসিল। প্রত্যহ যুবরাজের কাছে প্রজারা আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাদের কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। মথুর কহিল, "মহারাজ, আপনি যে মাসে রায়গড়ে আসিয়াছিলেন সেই মাসে আমার এই ছেলেটি জন্মায়, আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার পরে আপনার আশীর্বাদে আমার আরো দুটি সন্তান জন্মিয়াছে"। বলিয়া

সে তাহার তিন ছেলেকে যুবরাজের কাছে আনিয়া কহিল, “প্রণাম করো।” তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরান আসিয়া কহিল, “এখান হইতে যশোর যাইবার সময় হুজুর যে নৌকায় গিয়াছিলেন, আমি সেই নৌকায় মাঝি ছিলাম, মহারাজ।” শীতল সর্দার আসিয়া কহিল, “মহারাজ, আপনি যখন রায়গড়ে ছিলেন, তখন আমার লাঠিখেলা দেখিয়া বকশিশ দিয়াছিলেন, আজ ইচ্ছা আছে একবার আমার ছেলেদের খেলা মহারাজকে দেখাইব। এস তো বাপধন, তোমরা এগোও তো।” বলিয়া ছেলেদের ডাকিল। এইরূপ প্রত্যহ সকাল হইলে উদয়াদিত্যের কাছে দলে দলে প্রজারা আসিত ও সকলে একত্রে মিলিয়া কথা কহিত।

এইরূপ স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতই উদয়াদিত্যের মন হইতে ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি চোখ বুজিয়া মনে করিলেন, পিতা হয়তো রাগ করেন নাই, তিনি হয়তো সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নহিলে এত দিন আর কি কিছু করিতেন না।

কিন্তু এরূপ চোখ-বাঁধা বিশ্বাসে বেশিদিন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার দাদামহাশয়ের জন্য মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল। যশোহরে ফিরিয়া যাইবার কথা দাদামহাশয়কে বলা বৃথা; তিনি স্থির করিলেন– একদিন লুকাইয়া যশোহরে পলাইয়া যাইব। আবার সেই কারাগার মনে পড়িল। কোথায় এই আনন্দের স্বাধীনতা আর কোথায় সেই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র কারাগারের একঘেয়ে জীবন। কারাগারের সেই প্রতিমুহূর্তকে এক-এক বৎসর রূপে মনে পড়িতে লাগিল। সেই নিরালোক, নির্জন বায়ুহীন, বদ্ধ ঘরটি কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলেন, এখান হইতে একদিন সেই কারাগারের অভিমুখে পলাইতে হইবে। আজই

পলাইব– এমন কথা মনে করিতে পারিলেন না। একদিন পলাইব– মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা, আজ যাত্রা হইতে পারে না, কাল হইবে। আজ দিন বড়ো খারাপ। সকাল হইতে ক্রমাগত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত আকাশ লেপিয়া মেঘ করিয়া আছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় রায়গড় ছাড়িয়া যাইতেই হইবে বলিয়া উদয়াদিত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে যখন বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড়ো দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটা ভালো মনে পড়িতেছে না, কেবল মনে আছে, তোতে আমাতে যেন– যেন জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইতেছে।"

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না, দাদামহাশয়। ছাড়াছাড়ি যদি বা হয় তো জন্মের মতো কেন হইবে?"

বসন্ত রায় অন্যদিকে চাহিয়া ভাবনার ভাবে কহিলেন, "তা নয় তো আর কী। কতদিন আর বাঁচিব বল্, বুড়া হইয়াছি।"

গত রাত্রের দুঃস্বপ্নের শেষ তান এখনো বসন্ত রায়ের মনের গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাই তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছিলেন।

উদয়াদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "দাদামহাশয়, আবার যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তো কী হইবে।"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের গলা ধরিয়া কহিলেন, "কেন ভাই, কেন ছাড়াছাড়ি হইবে? তুই আমাকে ছাড়িয়া যাস নে। এ বুড়া বয়সে তুই আমাকে ফেলিয়া পালাস নে ভাই!"

উদয়াদিত্যের চোখে জল আসিল। তিনি বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনের অভিসন্ধি যেন বসন্ত রায় কী করিয়া টের পাইয়াছেন। নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি কাছে থাকিলেই যে তোমার বিপদ ঘটিবে দাদামহাশয়।"

বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, "কিসের বিপদ ভাই? এ বয়সে কি আর বিপদকে ভয় করি। মরণের বাড়া তো আর বিপদ নাই। তা মরণ যে আমার প্রতিবেশী। সে নিত্য আমার তত্ত্ব লইতে পাঠায়, তাহাকে আমি ভয় করি না। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বুড়া বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তীরে আসিয়া তাহার নৌকাডুবি হইলই বা!"

উদয়াদিত্য আজ সমস্ত দিন বসন্ত রায়ের সঙ্গে রহিলেন। সমস্ত দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিকালবেলায় বৃষ্টি ধরিয়া গেল, উদয়াদিত্য উঠিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, "দাদা, কোথায় যাস?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "একটু বেড়াইয়া আসি।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "আজ নাই-বা গেলি।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন দাদামহাশয়?"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "আজ তুই বাড়ি হইতে বাহির হস নে, আজ তুই আমার কাছে থাক্ ভাই!"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি অধিক দূর যাইব না দাদামহাশয়, এখনই ফিরিয়া আসিব।" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাসাদের বহির্দ্বারে যাইতেই একজন প্রহরী কহিল, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে যাইব?"

যুবরাজ কহিলেন, "না, আবশ্যক নাই।"

প্রহরী কহিল, “মহারাজের হাতে অস্ত্র নাই!”

যুবরাজ কহিলেন, “অস্ত্রের প্রয়োজন কী?”

উদয়াদিত্য প্রাসাদের বাহিরে গেলেন। একটি দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ আছে, সেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। একলা বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের আলো মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মনে কত কী ভাবনা উঠিল। যুবরাজ তাঁহার এই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছু স্থির নাই, কোথাও স্থিতি নাই– পরের মুহূর্তেই কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই। বয়স অল্প, এখনো জীবনের অনেক অবশিষ্ট আছে কোথাও ঘরবাড়ি না বাঁধিয়া কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া এই সুদূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ এমন করিয়া কিরূপে কাটিবে? তাহার পর মনে পড়িল– বিভা। বিভা এখন কোথায় আছে? এত কাল আমিই তাহার সুখের সূর্য আড়াল করিয়া বসিয়া ছিলাম, এখন কি সে সুখী হইয়াছে? বিভাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করিলেন।

মাঠের মধ্যে রৌদ্রে রাখালদের বসিবার নিমিত্ত অশথ বট খেজুর সুপারি প্রভৃতির এক বন আছে– যুবরাজ তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার করিয়াছে। যুবরাজের আজ পলাইবার কথা ছিল– সেই সংকল্প লইয়া তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। বসন্ত রায় যখন শুনিবেন উদয়াদিত্য পলাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তখন তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া করুণ মুখ করিয়া বলিবেন, “অ্যাঁ, দাদা আমার কাছ হইতে পলাইয়া গেল!’ সে ছবি তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এমন সময়ে একজন রমণী কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “এই যে গা, এইখানে তোমাদের যুবরাজ– এইখানে!”

দুইজন সৈন্য মশাল হাতে করিয়া যুবরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আরো অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন সেই রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে চিনিতে পার কি গা। একবার এইদিকে তাকাও! একবার এইদিকে তাকাও!" যুবরাজ মশালের আলোকে দেখিলেন, রুক্মিণী। সৈন্যগণ রুক্মিণীর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "দূর হ মাগী।" সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কহিতে লাগিল, "এ-সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ-সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ-সব সৈন্যদের এখানে কে আনিয়াছে? আমি আনিয়াছি। আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম, আর তুমি–।" যুবরাজ ঘৃণায় রুক্মিণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যগণ রুক্মিণীকে বলপূর্বক ধরিয়া তফাত করিয়া দিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, কী খবর?"

মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল, "জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী আদেশ।"

মুক্তিয়ার খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র বাহির করিয়া যুবরাজের হাতে দিল।

যুবরাজ পড়িয়া কহিলেন, "ইহার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেই তো আমি যাইতাম। আমি তো আপনিই যাইতেছিলাম, যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোহরে ফিরিয়া যাই।" মুক্তিয়ার খাঁ হাত জোড় করিয়া কহিল, "এখনই ফিরিতে পারিব না।" যুবরাজ ভীত হইয়া কহিলেন, "কেন?" মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "আর-একটি আদেশ আছে, তাহা পালন না করিয়া যাইতে পারিব না।"

যুবরাজ ভীতস্বরে কহিলেন, “কী আদেশ!”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।”

যুবরাজ চমকিয়া উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “না, করেন নাই, মিথ্যা কথা।”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “আজ্ঞা যুবরাজ, মিথ্যা নহে। আমার নিকট মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।”

যুবরাজ সেনাপতির হাত ধরিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ দিয়াছেন যে, যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্ত রায়ের– আমি যখন আপনি ধরা দিতেছি তখন আর কী! আমাকে এখনই লইয়া চলো, এখনই লইয়া চলো– আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলো, আর বিলম্ব করিয়ো না।”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নাই। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন।”

যুবরাজ অধীর হইয়া কহিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছ! তাঁহার অভিপ্রায় এরূপ নহে। আচ্ছা চলো, যশোহরে চলো। আমি মহারাজের সম্মুখে তোমাদের বুঝাইয়া দিব, তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন, তবে আদেশ সম্পন্ন করিয়ো।”

মুক্তিয়ার জোড়হস্তে কহিল, “যুবরাজ, মার্জনা করুন তাহা পারিব না।” যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া কহিলেন, “মুক্তিয়ার, মনে আছে, আমি এক কালে সিংহাসন পাইব? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।”

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিলেন, “মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরাপরাধ পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।”

উদয়াদিত্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “মিথ্যা কথা। যে ধর্মশাস্ত্রে তাহা বলে, সে ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা। নিশ্চয়ই জানিয়ো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ।”

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি গড়ে ফিরিয়া যাই। তোমার সৈন্যসামন্ত লইয়া সেখানে যাও, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তার পরে তোমার আদেশ পালন করিয়ো।”

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৈন্যগণ অধিকতর ঘেঁষিয়া আসিয়া যুবরাজকে ঘিরিল। যুবরাজ কোনো উপায় না দেখিয়া সেই অন্ধকারে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “দাদামহাশয়, সাবধান।” বন কাঁপিয়া উঠিল, মাঠের প্রান্তে গিয়া সে সুর মিলাইয়া গেল। সৈন্যেরা আসিয়া উদয়াদিত্যকে ধরিল। উদয়াদিত্য আর-একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “দাদামহাশয়, সাবধান।” এক জন পথিক মাঠ দিয়া যাইতেছিল– শব্দ শুনিয়া কাছে আসিয়া কহিল, “কে গা।” উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, “যাও যাও, গড়ে ছুটিয়া যাও, মহারাজকে সাবধান করিয়া দাও।” দেখিতে দেখিতে সেই পথিককে সৈন্যেরা গ্রেপ্তার করিল। যে কেহ সেই মাঠ দিয়া চলিয়াছিল, সৈন্যেরা অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিল।

কয়েকজন সৈন্য উদয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া রহিল, মুক্তিয়ার খাঁ এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া সহজ বেশে গড়ের অভিমুখে গেল। রায়গড়ের শতাধিক দ্বার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া তাহারা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সন্ধ্যাকালে বসন্ত রায় বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। ওদিকে রাজবাড়ির ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপূজার শাঁখ ঘণ্টা বাজিতেছে। বৃহৎ রাজবাটীতে কোনো কোলাহল নাই, চারিদিক

নিস্তব্ধ। বসন্ত রায়ের নিয়মানুসারে অধিকাংশ ভৃত্য সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পাইয়াছে।

আহ্নিক করিতে করিতে বসন্ত রায় সহসা দেখিলেন, তাঁহার ঘরের মধ্যে মুক্তিয়ার খাঁ প্রবেশ করিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, এ ঘরে প্রবেশ করিয়ো না। আমি এখনই আহ্নিক সারিয়া আসিতেছি।"

মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত রায় আহ্নিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, ভালো আছ তো?"

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "আহারাদি হইয়াছে?"

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হাঁ

বসন্ত রায়। "আজ তবে তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই।"

মুক্তিয়ার কহিল, "আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনই যাইতে হইবে।"

বসন্ত রায়। না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না, আজ এখানে থাকিতেই হইবে।

মুক্তিয়ার। না মহারাজ, শীঘ্রই যাইতে হইবে।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বলো দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভালো আছে তো?"

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্ত রায়। তবে কী তোমার কাজ, শীঘ্র বলো। বিশেষ জরুরি শুনিয়া উদ্বেগ হইতেছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নাই?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞে না, তাঁহার কোনো বিপদ ঘটে নাই। মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী আদেশ? এখনই বলো।”

মুক্তিয়ার খাঁ এক আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হাতে দিল। বসন্ত রায় আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একে একে সমুদয় সৈন্য দরজার নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

পড়া শেষ করিয়া বসন্ত রায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি প্রতাপের লেখা?”

মুক্তিয়ার কহিল, “হাঁ।”

বসন্ত রায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “খাঁ সাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?”

মুক্তিয়ার কহিল, “হাঁ মহারাজ।”

তখন বসন্ত রায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, “খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছি।”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, অবশেষে আবার কহিলেন, “প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম, সে আমাকে একমুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সেই প্রতাপ বড়ো হইল, তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম, তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম– এই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে খাঁ সাহেব?”

মুক্তিয়ার খাঁর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সে অধোবদনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা কহিলেন, “দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "তিনি বন্দী হইয়াছেন। মহারাজের নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "উদয় বন্দী হইয়াছে? বন্দী হইয়াছে খাঁ সাহেব? আমি একবার তাহাকে কি দেখিতে পাইব না?"

মুক্তিয়ার খাঁ জোড়হাত করিয়া কহিল, "না জনাব, হুকুম নাই।"

বসন্ত রায় সাশ্রুনেত্রে মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া কহিলেন, "একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ সাহেব!"

মুক্তিয়ার কহিল, "আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।"

বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এস সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।"

মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ, আমাকে মার্জনা করিবেন– আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নাই।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী?" বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন কহিলেন, "প্রতাপকে বলিয়ো, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ– দেখিয়ো অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।"

বলিয়া বসন্ত রায় চোখ বুঁজিয়া ইষ্টদেবতার নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন ও কহিলেন, "সাহেব এইবার।"

মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, “আবদুল।” আবদুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবদুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। গৃহে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুই দিন উদয়াদিত্য খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলেন না, কাহারও সহিত একটি কথাও কহিলেন না, কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাষাণমূর্তির ন্যায় স্থির– তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই– কেবলই ভাবিতেছিলেন। নৌকায় উঠিলেন, নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল– দাঁড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কানে প্রবেশ করিল। তবুও কিছুই শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল, মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া রাখিল, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল। কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোটো ছোটো তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে– যুবরাজ একদৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল, নৌকা খুলিয়া দিল, উষার বাতাস বহিল, পূর্বদিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসিয়া হু হু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল– হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল– তীরে গাছপালাগুলি মেঘের মতো চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিয়া বসিল, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “যুবরাজ, কী ভাবিতেছেন।” যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন,

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধ প্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ভাবিতেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কী করিলাম। আমার জন্য কী সর্বনাশই হইল। হে বিধাতা, যাহারা দুর্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না, যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কী উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে, তাহাকেই ডুবায়, পৃথিবীর সকল কাজে বাধা দেয়– নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর- সকলকেও ভারাক্রান্ত করে। আমি একজন দুর্বল ভীরু, ঈশ্বর আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহারা সংসারের আনন্দ ছিল, সংসারের ভরসা ছিল– আমার জন্য তাহাদেরই বিনাশ করিলেন। আর না, এ সংসার হইতে আমি বিদায় হইলাম।"

উদয়াদিত্য বন্দিভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, অনিবার্য ঘৃণায় তাঁহার সর্ব শরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল– তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?"

উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করেন।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না। আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।"

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কী করিয়া জানিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দুর্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের স্বার্থের জন্য কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব– আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না। সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি তবে কী চাও?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না, কেবল আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো গারদে পুরিয়া রাখিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনই কাশী চলিয়া যাই। আর-একটি ভিক্ষা– আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন। আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।"

সেইদিনই উদয়াদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন, "মা কালী, তুমি সাক্ষী থাকো, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি– যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না। যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদামহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়।" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মহারানী যখন শুনিলেন, উদয়াদিত্য কাশী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া চল্।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সে কী কথা মা। তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, “বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব? রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, তোকে সেখানে কে দেখিবে? তোর পিতা পাষাণ বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না।” মহিষী তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভালোবাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্য তিনি বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন, “মা তুমি তো জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার পদে পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, আমি বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই।”

উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন, “বিভা,দিদি আমার, কাশী যাইবার আগে তোকে সুখী করিয়া যাইব। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তোকে শশুরবাড়ি লইয়া যাইব, এই আমার একমাত্র সাধ আছে।”

বিভা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদামহাশয় কেমন আছেন?”

“দাদামহাশয় ভালো আছেন।” বলিয়াই উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য ও বিভার যাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। বিভা মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল। অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, শ্বশুরালয়ে যাইবার আগে সকলেই বিভাকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিল।

মহিষী একবার উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, "বাবা, বিভাকে তো লইয়া যাইতেছ, যদি তাহারা অযত্ন করে।"

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেন মা, তাহারা অযত্ন করিবে কেন?"

মহিষী কহিলেন, "কী জানি তাহারা যদি বিভার উপর রাগ করিয়া থাকে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "না মা, বিভা ছেলেমানুষ, বিভার উপর কি তাহারা কখনো রাগ করিতে পারে?"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, সাবধানে লইয়া যাইয়ো, যদি তাহারা অনাদর করে তবে আর বিভা বাঁচিবে না।"

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শ্বশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্মফল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন এখনও শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিণামস্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কী আছে কে জানে।

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাঁদিলেন না, তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অন্যান্য

গুরুজনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন, “বৎস, যে সিংহাসনে তুমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে।” রাজবাড়ির ভৃত্যেরা উদয়াদিত্যকে বড়ো ভালোবাসিত, তাহারা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রঙ্গভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল– জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ-বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোরহৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব পারে বনান্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা ঊর্ধ্বশিখা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে। লোকজন জাগিয়া উঠিয়াছে। মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, “জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।”

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের গান ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন। বিভার প্রশান্ত হৃদয়ে আনন্দের উষালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখে চোখে অরুণের দীপ্তি। সে যেন এতদিনের পর একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া

জগতের মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিতেছে? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে– বিভা ছোটো পাখিদের মতো ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্ত হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারিদিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া জলের কল্লোলের ন্যায় মৃদু স্বরে তাহাকে কত কী কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। যাহা শুনিল, বিভার তাহাই ভালো লাগিল।

রামচন্দ্র রায়ের রাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল। কী সুন্দর শোভা। কুটিরগুলি দেখিয়া, লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কী সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে মনে কেমন একপ্রকার অপূর্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল সকলকেই তাহার ভালো লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-একজন দরিদ্র দেখিতে পাইল; বিভা মনে মনে কহিল, “আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।” সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ-রাজ্যে যে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটীতে তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে।

উদয়াদিত্য মনে করিলেন কাল প্রাতে লোক পাঠানো যাইবে। বিভার মনের ইচ্ছা আজই সংবাদ দেওয়া হয়।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ লোকজনেরা ভারি ব্যস্ত। চারিদিকে বাজনা বাজিতেছে। গ্রামে যেন একটি উৎসব পড়িয়াছে। একে বিভার প্রাণে অধীর আনন্দ জাগিতেছে, তাহার 'পরে চারিদিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পাছে উদয়াদিত্যের কাছে তাহার এই অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্য কত কষ্টে সে হাসি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। উদয়াদিত্য নদীতীরে উৎসবের ভাব দেখিয়া কী হইতেছে জানিবার জন্য গ্রামে বেড়াইতে গেলেন।

এমন কিছুক্ষণ গেল। একজন তীর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাদের নৌকা গা?" নৌকা হইতে রাজবাটীর ভৃত্যেরা বলিয়া উঠিল, "কে ও? রামমোহন যে? আরে, এস এস।" রামমোহন তাড়াতাড়ি নৌকায় প্রবেশ করিল। নৌকায় একলা বিভা বসিয়া আছে, রামমোহনকে দেখিয়া হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "মোহন।"

রামমোহন। মা।

রামমোহন বিভার সেই সরল আনন্দে পরিপূর্ণ হাসিহাসি মুখখানি অনেকক্ষণ দেখিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মা তুমি আসিলে?"

বিভা তাড়াতাড়ি কহিল, "হাঁ, মোহন। মহারাজ কি ইহারই মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুই কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস?"

রামমোহন কহিল, "না মা, অত ব্যস্ত হইয়ো না। আজ থাক্, আর-একদিন লইয়া যাইব।"

রামমোহনের ভাব দেখিয়া বিভা একবারে মলিন হইয়া গিয়া কহিল, "কেন মোহন, আজ কেন যাইব না।"

রামমোহন কহিল, "আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে– আজ থাক্ মা।"

বিভা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, "সত্য করিয়া বল্ মোহন, কী হইয়াছে?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না। আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই। সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল, "মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই, তোমার রাজবাটীতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।"

বিভার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হাত-পা হিম হইয়া গেল। রামমোহন কহিতে লাগিল, "মা, যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা? তখন তুই নিষ্ঠুর পাষাণী হইয়া আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলি মা? মহারাজের কাছে আমার যে আর মুখ রহিল না। বুক ফাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না!"

বিভা আর চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, মাথা ঘুরিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। রামমোহন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিভার মুখে-চোখে ছিটা দিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা উঠিয়া বসিল। এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙিয়া গেছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া, রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া তৃষার্তহৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল।

বিভা আকুলভাবে কহিল, "মোহন, তিনি যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন– আমার আসিতে কি বড়ো বিলম্ব হইয়াছে?"

মোহন কহিল, "বিলম্ব হইয়াছে বই কি।"

বিভা অধীর হইয়া কহিল, "আর কি মার্জনা করিবেন না?"

মোহন কহিল, “মার্জনা আর করিলেন কই।”

বিভা কহিল, “মোহন, আমি কেবল একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইব।” বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল।

রামমোহন চোখ মুছিয়া কহিল, “আজ থাক্ না, মা।”

বিভা কহিল, “না মোহন, আমি আজই একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।”

রামমোহন কহিল, “যুবরাজ আগে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসুন।”

বিভা কহিল, “না মোহন, এখনই একবার যাই।”

বিভা মনে করিয়াছিল, উদয়াদিত্য এ সংবাদ শুনিলে অপমানের ভয়ে পাছে না যাইতে দেন।

রামমোহন কহিল, “তবে একখানি শিবিকা আনাই।”

বিভা কহিল, “শিবিকা কেন? আমি কি রানী যে শিবিকা চাই। আমি একজন সামান্য প্রজার মতো, একজন ভিখারিনীর মতো যাইব, আমার শিবিকায় কাজ কী?”

রামমোহন কহিল, “আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না।”

বিভা কাতর স্বরে কহিল, “মোহন, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে আর বাধা দিস্ নে, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।”

রামমোহন ব্যথিতহৃদয়ে কহিল, “আচ্ছা মা, তাহাই হউক।”

বিভা সামান্য রমণীর বেশে নৌকা হইতে বাহির হইল। নৌকার ভৃত্যেরা আসিয়া কহিল, “এ কী মা, এমন করিয়া এ বেশে কোথায় যাও!”

রামমোহন কহিল, “এ তো মায়ের রাজ্য, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।”

ভৃত্যেরা আপত্তি করিতে লাগিল, রামমোহন তাহাদের ভাগাইয়া দিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে লোকজন, চারিদিকেই ভিড়। আগে হইলে বিভা সংকোচে মারিয়া যাইত, আজ কিছুই যেন তাহার চোখে পড়িতেছে না। যাহা কিছু দেখিতেছে সমস্ত যেন বিভার মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। চারিদিকে যেন একটা কোলাহলময় স্বপ্নের ঘেঁষাঘেঁষি– কিছুই যেন কিছু নয়। চারিদিকে একটা ভিড় চোখে পড়িতেছে এই পর্যন্ত, চারিদিক হইতে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে এই পর্যন্ত, তাহার যেন একটা কোনো অর্থ নাই।

ভিড়ের মধ্য দিয়া রাজপুরীর দ্বারের নিকট আসিতেই একজন দ্বারী সহসা বিভার হাত ধরিয়া বিভাকে নিবারণ করিল, তখন সহসা বিভা একমুহূর্তে বাহ্য জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িল, চারিদিক দেখিতে পাইল, লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার ঘোমটা খুলিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল। রামমোহন আগে আগে যাইতেছিল, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারীর প্রতি চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল। অদূরে ফর্নাণ্ডিজ ছিল,যে আসিয়া দ্বারীকে ধরিয়া বিলক্ষণ শাসন করিল। বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অন্যান্য দাসদাসীর ন্যায় বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে সমাদর করিল না।

ঘরে কেবল রাজা ও রমাই ভাঁড় বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজার পায়ের কাছে ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুই? ভিখারিনী? ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস?”

বিভা নত মুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “না মহারাজ, আমার সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।”

রামমোহন থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনার মহিষী– যশোহরের রাজকুমারী।"

সহসা রামচন্দ্র রায়ের প্রাণ যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমাই ভাঁড় হাসিয়া রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কেন, এখন কি আর দাদাকে মনে ধরে না নাকি?"

রামচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে করুণার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি রমাইয়ের কথায় তিনি নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিভাকে এখন মমতা দেখাইলে পাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রাঘাত হইল, সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। চোখ বুজিয়া মনে মনে কহিল, মা গো, বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও। কাতর হইয়া চারিদিকে চাহিল, রামমোহনের মুখের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাই ভাঁড়ের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদবি করিস!"

রামমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "মহারাজ, আমি বেয়াদবি করিলাম। তোমার মহিষীকে– আমার মা-ঠাকরুনকে বেটা অপমান করিল– উহার হইয়াছে কী, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।"

রাজা রামমোহনকে ধমক দিয়া কহিলেন, "কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না।"

বিভার মুখ নীল হইয়া গেল, সে মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল, থর থর করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে বিভা মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন

রামমোহন জোড়হস্তে রাজাকে কহিল, “মহারাজ, আজ চারপুরুষে তোমার বংশে আমরা চাকরি করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মা-ঠাকরুনকে অপমান করিলে, তোমার রাজ্যলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে, আজ আমিও তোমার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম। আমার মা-ঠাকরুনের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও এ রাজবাটীর ছায়া মাড়াইব না।” বলিয়া রামমোহন রাজাকে প্রণাম করিল ও বিভাকে কহিল, “আয় মা, আয়। এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া আয়। আর একমুহূর্তও এখানে থাকা নয়।” বলিয়া বিভাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দ্বারের নিকট অনেকগুলি শিবিকা ছিল, তাহার মধ্যে একটিতে হতজ্ঞান অবসন্ন বিভাকে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কাশী চলিয়া গেল। সেইখানে দানধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় জীবন কাটাইতে থাকিল। রামমোহন যতদিন বাঁচিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারামও সপরিবারে কাশীতে আসিয়া উদয়াদিত্যের আশ্রয় লইল।

চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে– “বউঠাকুরাণীর হাট।”